পৌরুষ

মুহম্মদ জুবায়ের

১

ফ্লাইট পৌঁছেছিলো সময়মতোই, প্লেনের দরজায় প্লাস্টিক-হাসি নিয়ে দাঁড়ানো বিমান-সুন্দরী বলে, হ্যাভ আ নাইস ডে। জবাবে পরিষ্কার বাংলায় তুমিও বলে বেরিয়ে আসে বিজু। জানে প্লাস্টিকবালা তার জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করে নেই, বিজু কিছু বললো কি বললো না তা নিয়ে মাথাও ঘামাবে না সে। শুধু বিজু কেন, কারো জবাবই সে শুনবে না, তার মুখস্থ হ্যাভ আ নাইস ডে-র জবাব সে চায় না। প্লেন ল্যান্ড করার পর যাত্রীরা বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে হাস্যমুখে তাকে ওই এক বাক্যের সম্ভাষণ আউড়ে যেতে হবে এক নাগাড়ে। মাথাপিছু একবার। চাকরি।

ব্যাগেজের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। সত্যি হয়তো অনেকক্ষণ নয়, কিন্তু ভ্রমণের ক্লান্তি আর অবসাদ অনেক সময় সেরকম ধারণা দিয়ে থাকে বটে। যেমন এখন। হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বিজু, সাড়ে সাতটা। এখনো ঈস্ট কোস্টের সময় দেখাচ্ছে। কাঁটা ঘুরিয়ে সাড়ে ছ'টা করে দেয়। স্থানীয় সময়। বাংলাদেশে এখন সকাল সাড়ে ছ'টা, ঠিক বারো ঘণ্টার তফাৎ।

মনে মনে ঢাকার সঙ্গে এই সময় অনুবাদের অভ্যাস তার যায়নি এখনো। বারো বছর পরেও। সময় অনুবাদ করে মন থেমে থাকে না। দেখে মা সকালের চা নিয়ে বারান্দায় বসেছে, কাজের লোকজনের তদারকি করছে। মগবাজারের মোড়ে ক্যাফে তাজ-এর সামনের চুলায় আগুন দেওয়া হয়েছে, বিশাল তাওয়ার ওপরে পরোটা। দূরপাল্লার বাসগুলো রওনা হচ্ছে। রমনায় বয়স্ক মানুষদের হাঁটাহাঁটি। শহর জেগে উঠেছে আরেকটি দিনের জন্যে। এইসব বিজুর নিজস্ব বিনোদন।

আজকের বিমানযাত্রায় অবশ্য ক্লান্ত-অবসন্ন হওয়ার কথা নয়। ফ্লাইটের সময় খুব দীর্ঘ ছিলো না, ঘণ্টাতিনেক। বিমানভ্রমণের জন্যে দু'তিন ঘণ্টার ফ্লাইটই আদর্শ। ঢাকা-কক্সবাজার বা ঢাকা-কলকাতার বিমানযাত্রা অসহনীয় রকমের বিরক্তিকর লাগে বিজুর, প্লেনে উঠে জুতমতো বসতে না বসতেই ল্যান্ডিং-এর ঘোষণা।

এখান থেকে ঢাকায় যাতায়াত আরেক মেরুর অভিজ্ঞতা, সে অনন্তযাত্রা আর শেষ হয় না, শেষ হবে এমন ভরসাও একসময় ক্ষীয়মাণ হয়ে আসতে থাকে। প্লেনের ভেতরে একঘেয়ে গোঁ গোঁ শব্দ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মেঘদলের ভেতর দিয়ে উড়ে যাওয়ার খেলা, সেই অপরূপ সুন্দর দৃশ্যও অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়, অবিলম্বে তা ক্লান্তিকর ঠেকে। স্থবির-অনড় সৌন্দর্যও একসময় একঘেয়ে মনে হয়, চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মুখের ভেতরে এক ধরনের তেতো স্বাদ স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়, কোনো খাবার মুখে রোচে না – সব

খাবারের স্বাদ-গন্ধ একই রকমের লাগে। বসে থাকতে থাকতে হাত-পা অবশ হয়। শরীরের বাঁধনগুলো আলগা হয়ে যায় বলে মনে হয়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। বিজু প্লেনে একদম ঘুমাতে পারে না। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই চমকে জেগে ওঠে, ঘুমাতে না পারার কষ্টে শরীর নির্যাতিত হতে থাকে।

ব্যাগেজ সংগ্রহের নির্দিষ্ট জায়গায় ক্যারুসেল এখনো নড়াচড়া শুরু করেনি, সুতরাং এখন দাঁড়িয়ে থাকো। বিরক্তিকর। গন্তব্যে পৌঁছে ব্যাগেজের জন্যে অপেক্ষা এক যন্ত্রণা। ফ্লাইটের জন্যে বসে থাকা যায় – ওয়েটিং এরিয়ায় খবরের কাগজের পাতায় সময় কাটে, এক কাপ কফি কিনে নিয়ে ওভারহেড টিভিতে সিএনএন দেখা যায়।

তিন বছর আগের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকাকে বদলে দিয়েছে, তাদের পরিণত করেছে সিজোফ্রেনিক এক জনগোষ্ঠীতে। সবকিছুতে এখন সন্ত্রাসের আতংক। পুকুরের পানিতে নিরীহ সাদা রঙের কিছু দেখলে অ্যানথ্রাক্স বলে সন্দেহ। সারা পৃথিবীকে তারা এই অজুহাতে বদলে দিতে চায়। একে ধরো, ওকে মারো, তাকে হটাও – এসব চলছে সেই থেকে।

এই আতংকের চেহারা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান এয়ারপোর্টে। সিকিউরিটি চেকিং-এর সময় শুধু পরনের প্যান্ট আর জামা খুলতে হয় না। পায়ের জুতা, কোমরের বেল্ট খোলো, সেলফোন, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, খুচরো পয়সা, চাবির গোছা বের করে সিকিউরিটির বাস্কেটে দাও। তারপর মেটাল ডিটেক্টর লাগানো দরজার ভেতর দিয়ে হাঁটো। পিক আওয়াজ হলো তো ফিরে গিয়ে ভালো করে দেখো শরীরের কোথাও ধাতব আর কিছু আছে কি না। ব্যাগের মধ্যে ছুরি-কাঁচি জাতীয় কিছু নেওয়া যাবে না, যতো ছোটোই হোক। ওগুলোই নাকি সন্ত্রাসীদের অস্ত্র। কী আশ্চর্য! 'হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র, আমি জমা দিইনি'! কে লিখেছিলো? নির্মলেন্দু গুণ। নতুন নিয়মকানুন জারি হওয়ার কালে বিজুর মনে হয়েছিলো, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভল্যুমগুলোও নিষিদ্ধ করার কথা কারো মনে পড়েনি কেন? ছোটোখাটো ছুরি-টুরির চেয়ে ওগুলোর ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশি ছাড়া কম নয়।

কাচের দেয়ালের বাইরে তাকিয়ে দেখা যায়, শরতের রোদ মরে এসেছে। প্লেন নামার সময় ঘোষণা শুনেছিলো, স্থানীয় তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইট। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও আজকাল মেট্রিক পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে, অথচ এদেশে যে কেন পুরোপুরি চালু হলো না, কে জানে! অদ্ভুত এক জবরজং হয়ে আছে – টাকাপয়সার হিসেবে দশমিক, পাশাপাশি চালু আছে দূরত্বসূচক ফুট-গজ-মাইল, ওজনের বেলায় আউন্স-পাউন্ড। ওষুধপত্রে মিলিগ্রাম। গ্যাস স্টেশনে যাও, সেখানে আবার গ্যালনের হিসেব। দোকানে কোকাকোলার বিশ আউন্সের বোতলের পাশে দু'লিটারের বোতলের নির্বিরোধ সহাবস্থান।

আমেরিকার সাধারণ মানুষদের, যাদের সবার নামই নাকি জো ব্লো, আইকিউ-এর দৌড় নিয়ে অনেক মজার গল্প চালু আছে, সেটাই হয়তো এই জগাখিচুড়ি অবস্থাটা স্থায়ী করে রেখেছে। সেলসিয়াস বা মিটার শুনলে তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে – এগুলো খায়, না মাথায় মাখে? আরো একটা কারণ আছে বলে বিজুর মনে হয় – বিখ্যাত মার্কিন কবির 'আই হ্যাভ মাইলস টু গো'-র শুদ্ধতা রক্ষাও দরকার। কিলোমিটারস টু গো বলা যাবে? বললে হাস্যকর শোনাবে না!

ব্যাগেজ এলাকায় অদৃশ্য সুড়ঙ্গ থেকে এখন কনভেয়র বেল্টে চড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন আকার ও চেহারার স্যুটকেস, নানা চেহারা ও স্বাস্থ্যের ব্যাগ, স্লিপিং ব্যাগ, কার্ডবোর্ডের বাক্স। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ঘুরন্ত ক্যারুসেলে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, থাকো – ক্যারুসেল তোমার ব্যাগেজটি সামনে এনে হাজির করলে টুপ করে তুলে নাও। কনভেয়র বেল্টে একটা চ্যাপ্টামতো লম্বা বাক্সও দেখা যায়, আকার দেখে ভেতরে কী আছে বোঝার উপায় নেই। সবই আসছে, শুধু বিজুর কালো রঙের ব্যাগটার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

ভেবে দেখলে খুব অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য। জীবনে অন্তত একবারও কি ওর ব্যাগেজ প্রথমদিকে আসতে পারে না? কনভেয়র বেল্টে কারো না কারো ব্যাগ বা স্যুটকেস তো প্রথমে আসবেই। সেই প্রথমটা কখনোই বিজুর নয়, এমনকী প্রথম দশ-পনেরোটার মধ্যেও তার ব্যাগেজের দেখা সে পায়নি এ জন্মে। এয়ারপোর্টে কাউকে হয়তো রিসিভ করতে এসেছে বিজু। তার যাত্রীটি অবধারিতভাবে একেবারে শেষের দিকে হেলেদুলে বেরিয়ে আসে – প্লেনের ভেতরে বসে এতোক্ষণ কী যে করে, কে জানে!

কাঁধে ঝোলানো হাতব্যাগ অসহ্য লাগছিলো। ভারী তেমন নয়, তবু অযথা ঘাড়ে তুলে রাখারও কোনো মানে হয় না। ব্যাগ বিজু পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে দাঁড়ায়। কনভেয়র বেল্টের ওপরে রাখা চোখে শিকারী মাছরাঙার একাগ্রতা। নৌকায় নানাবাড়ি যাওয়ার সময় দেখেছে, শূন্যে একই জায়গায় স্থির থেকে মাছরাঙা ক্রমাগত ডানা ঝাপটায়, তার অচঞ্চল চোখ নিচে পানির ভেতরে ভাসতে থাকা মাছের ওপর। অস্ত্র তার ঠোঁট, তাক করে আছে শিকারের দিকে।

কালো ব্যাগ শেষ পর্যন্ত দেখা দেয়। বিজু কনভেয়র বেল্ট থেকে ব্যাগ তুলে নিতেই পাশে দাঁড়ানো একজন হাসিমুখে বলে, সম্ভবত তোমার ভুল হয়েছে। ব্যাগটা আমার।

বটেই তো – এ রকমই হওয়ার কথা! হুবহু এক রকম দেখতে, তবু ব্যাগ ওর নয়! বিব্রত মুখে দুঃখিত বলে ব্যাগের দখল ছেড়ে দেয় বিজু। দুঃখিত সে হয়নি, বলার জন্যে বলা। দুঃখিত তার নিজের জন্যে হওয়া উচিত। যে কোনোকিছু ঠিক যেরকম ঘটা উচিত বলে মনে হয়, তার বেলায় কীভাবে যেন সব নিয়ম-কানুন পাল্টে যায়!

ব্যাগেজ এলাকার ভিড় কিছু পাতলা হয়ে যাওয়ার পর নিজের ব্যাগের দখল পেয়ে বিজু এসকেলেটরে নিচে নেমে আসে। নিচের এ জায়গাটা সুড়ঙ্গের মতো – আধো অন্ধকার। দিনদুপুরেও বাতি জ্বলে। যে রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে এয়ারপোর্টের সবগুলো টার্মিনাল ছুঁয়ে চলে গেছে, তার সমান্তরাল করে মাটির নিচে বানানো হ্রস্ব এই সুড়ঙ্গ-রাস্তাগুলো। সুড়ঙ্গগুলো খুব দীর্ঘ নয় বলে দু'দিক থেকে দিনের আলো কিছু আসে, নিউ ইয়র্কের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশনের মতো পুরো রাতের চেহারা পায় না। ওপরের মূল রাস্তা থেকে আলাদা হয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে আরেকদিক দিয়ে বেরিয়ে আবার সদর রাস্তায় উঠে পড়ো। এই সুড়ঙ্গ-রাস্তার পাশে বহির্গামী যাত্রীদের জন্যে চেক-ইন করার ব্যবস্থা, বিশেষ করে খুব ভারী লাগেজ থাকলে এখানে চেক-ইন করতে সুবিধা, টানাটানি করে ওপরে না গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোলে কাউন্টার। কাছে কাচে ঘেরা যাত্রীদের প্রবেশপথ, এসকেলেটরে ওপরে ডিপারচার লাউঞ্জে উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা। এলিভেটরও আছে। রাস্তার ওপারে আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা।

ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে বিভিন্ন জাতের সাইন দেখে বিজু বুঝে উঠতে পারে না, ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে বাসের জন্যে। দুটো বাস দাঁড়িয়ে আছে সামান্য দূরত্বে, এগুলোর একটাও ওর নয়। এয়ারপোর্টের পশ্চিমে গাড়ি পার্কিং এলাকায় যাবে একটা, অন্যটা শাট্‌ল্ বাস – যাত্রীদের নিয়ে যাবে শহরের ভেতরে যাত্রীদের যার যার হোটেল বা বাড়ির ঠিকানায়। ওর বাসও ওখানে আসবে নিশ্চয়ই। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে ভাবে, সিগারেট ধরানো দরকার। বস্টন এয়ারপোর্টে ঢোকার আগে শেষ সিগারেট খেয়েছে – পাঁচ ঘণ্টারও বেশি।

আজকাল কোনো ফ্লাইটেই সিগারেট খাওয়া যায় না। এমনকী কোথাও কোথাও এয়ারপোর্টের ভেতরেও নয়। কোনো কোনো এয়ারপোর্টের ভেতরে অবশ্য ধূমপানের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা করে দেওয়া আছে। আটলান্টায় দেখেছে, পাশাপাশি দুটো খাঁচার মতো ঘর, সেখানে বসে ধূমপান করা যায়। কোরিয়ার সিউল এয়ারপোর্টে দেখেছিলো আরো ভয়াবহ অবস্থা। কাচঘেরা দরজাবন্ধ ঘরে সিগারেট খেতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়েছিলো। ঢোকার আগে বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছিলো, ঘরটি ধোঁয়ায় ধূসর। বেরিয়ে আসার পর মনে হয়, ওই ঘরে ঘণ্টা দুয়েক কাউকে আটকে রেখে দিলে সারাজীবনের মতো সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে উড়ে যাবে। বিজু নিজে অবশ্য ওই ঘরে দু'ঘণ্টা থাকবে না, সিগারেট ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে কখনো হলে দেখা যাবে।

প্রায় সারা পৃথিবীতে এখন সিগারেটখোরদের বড়ো দুর্দিন, প্রায় জাতগোত্রহীন প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের। এ দেশে পুলিশে ধরে পেটালে পুলিশের নামে মামলা ঠুকে

দেওয়ার অধিকার আছে, অথচ সিগারেটের মতো জরুরি বিষয় নিয়ে যে এতো খবরদারি চলছে সেখানে অধিকারবোধের কথা কেউ যে মনেও রাখছে না! বিজু মাঝে মাঝে ভাবে, বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় একটা জঙ্গী আন্দোলন করে ফেলা যায় না? নিদেনপক্ষে একখানা হরতালের ডাকও তো দেওয়া যায়!

সিগারেট ধরাবে কি না এই দ্বিধায় পড়ে যায় বিজু। সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে একজোড়া বুড়োবুড়ি। ওদের ধূমপায়ী বলে মনে হচ্ছে না। ধূমপায়ীদের কপালে কোনো ছাপ মারা থাকে না, ওদেরও নেই। তবু তার ধারণা হয়, ওরা না-খাওয়া গোত্রের। ওদের সামনে সিগারেট ধরিয়ে ফেললে হয়তো মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু কপাল কুঁচকে এমনভাবে তাকাবে যেন বিশাল কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। এরকম অভিজ্ঞতা দু'একবার হয়েছে। গায়ের রং তামাটে দেখলে আগেও কেউ কেউ ভুরু কুঁচকে তাকাতো, আজকাল তা সারাক্ষণ মনে রাখতে হচ্ছে – তাদের এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। একসময় হয়তো পৃথিবী গায়ের রং দিয়েই বিভক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আলাদা করে নজরে না পড়ে ভিড়ে মিশে থাকাই ভালো।

দ্বিধায় পড়ার পরের কারণ কিছু জটিল। তার অভিজ্ঞতা বলছে, সিগারেট না ধরালে আরো মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হবে বাসের জন্যে। কিন্তু সে ঠিক জানে, যদি ধরিয়ে ফেলে, গোটা দুয়েক টান দেওয়ার পরেই বাসের দেখা পাওয়া যাবে। প্রায় আস্ত সিগারেট তখন ফেলে দিয়ে বাসে উঠে পড়তে হবে। মৌজ টুটে গেলে কারো ভালো লাগে! হাজার হোক, নেশার জিনিস তো বটে! একবার নয়, দু'বার নয় – অজস্রবার এরকম ঘটেছে। একবার অফিসের কাজে বিজুকে সিঙ্গাপুর যেতে হয়েছিলো মাসখানেকের জন্যে। পৃথিবীর অন্য অনেক শহরের মতো নয় সিঙ্গাপুর, সেখানে যখন-তখন ট্যাক্সি পাওয়া কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। অথচ তাড়ার সময় অনেকবার দেখেছে, সব খালি ট্যাক্সিগুলো যাচ্ছে উল্টোদিকে। বিরক্ত হয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে দেখেছে কিছুই বদলায়নি – ট্যাক্সিগুলো তখনো যাচ্ছে উল্টোদিকে, সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে ভুল জায়গায়!

এবারের ট্রিপটাও ব্যতিক্রম নয়। ডালাস ছাড়ার দিনে ফ্লাইট ছিলো দুপুর আড়াইটায়। দুপুরের খাওয়ার জন্যে বড্ড দেরি। সকালে জরুরি কিছু কাজ সেরে নেওয়ার জন্যে অফিসে যেতে হয়েছিলো, একটা অনির্ধারিত মিটিং-এও বসতে হয়। দেরি হয়ে যাচ্ছিলো বলে তাড়াহুড়ো করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা স্যান্ডউইচ আর বরফ-চা খেয়ে প্লেনে উঠেছিলো বিজু। অহো, বিমান আকাশে ওড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ট্রে-ভর্তি খাবার এসে হাজির। স্যান্ডউইচ, চিপ্‌স্, ব্রাউনি আর একখানা আস্ত আপেল।

অতোসব খাওয়ার অবস্থা ছিলো না বিজুর, আকাশযাত্রার একঘেয়েমি কাটাতে শুধু চিপ্‌স্‌ খানিকটা চিবিয়েছিলো। কিছু পরে এককাপ কফিও পাওয়া যায়। আজ ফেরার ফ্লাইট প্রায় একই সময়ে – বস্টনের সময় দুপুর পৌনে তিনটা। হাতের কাজকর্ম সারতে সারতে সাড়ে বারোটা। দুপুরের ট্র্যাফিক ঠেলে এয়ারপোর্টে পৌঁছতেও ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। বস্টনে বিজুর এই প্রথম। অচেনা শহরে একা ড্রাইভ করার সময় কিছু উৎকণ্ঠা থাকে, সময়মতো পৌঁছতে পারবো তো! একবার পথ ভুল করে ফেললে ঠিক রাস্তায় ফিরতে অনেকখানি সময় খরচ হয়ে যেতে পারে। ভাড়া করা গাড়ি আবার জায়গামতো ছাড়তে হবে।

সাত রকমের ব্যস্ততা আর উদ্বেগে দুপুরে খাওয়ার কথা বিজুর মনে পড়েনি। কোনোমতে প্লেনে উঠে নিজের সীটে বসতেই খিদে টের পায়। তিনদিন আগের অভিজ্ঞতা মনে করে নিশ্চিন্তও বোধ করে – খাবার প্রচুর দিয়েছিলো সেদিন। কিন্তু আশ্চর্য, কী করে যে ওরা বিজুকে চিনে ফেলে বার বার, কে জানে! আজকের ফ্লাইটে খাবার বলতে সাকুল্যে পাওয়া গেলো লিলিপুটদের দেশ থেকে আমদানি করা অতিশয় ছোটো এক প্যাকেট প্রেটজেল আর বাচ্চাদের খেলনা সাইজের প্লাস্টিকের গ্লাসে দু'চুমুক-সমান কোক।

খিদেয় এখন পেট জ্বলছে, ক্লান্তি আর অবসাদের কারণও সেখানেই। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে, তবু এয়ারপোর্টে কিছু একটা খেয়ে নিলে হতো। ইচ্ছে করেনি। পেটে এখন কিছু পড়া দরকার মনে হলেও বাড়ি ফিরে খাবে ঠিক করেছিলো। রানু অফিস থেকে এতোক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই। কাজের চাপ পড়লে মাঝেমধ্যে অবশ্য দেরি হয় তার। বিজুর আজ ফেরার কথা, রানুর মনে আছে কি না কে জানে!

হাতের কাছে খাবার না থাক, সিগারেট আছে। বিজুকে অবাক করে দিয়ে বুড়োবুড়ি দু'জনেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। জয় বাংলা! এবার আর আটকায় কে! দু'টান দেওয়ার পরে বাস আসে তো আসুক। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ঝুলিয়ে পকেট হাতড়ে মেজাজ খারাপ। লাইটার কোথায় গেলো? কোথায় পড়েছে, কে জানে! কলম, লাইটার এসব যারা সবসময় হারায়, বিজু সে দলের মানুষ নয়। ভ্রমণের সময় হাতব্যাগের ভেতর একটা-দুটো অতিরিক্ত লাইটার রাখে সে, খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্যাগের ভেতর এখন হাতড়াতে যাবে কে? বুড়োবুড়ির কাছে চাইতে হবে।

এখানে সিগারেটের আগুনও ধার করতে হয়। বলতে হবে, ক্যান আই বরো আ লাইট? যেন বাড়ি বয়ে গিয়ে কাল ধার করা আগুন ফেরত দিয়ে আসবে। আগে শুনেছিলো, আমেরিকায় ভিখারি বলে কিছু নেই। কিন্তু সিগারেটের ভিখারি যত্রতত্র। জীর্ণ কাপড় পরা বয়স্ক সাদা চামড়ার মানুষ, কখনো তরতাজা কৃষ্ণকায় যুবক নির্দ্বিধায় এগিয়ে এসে বলে, ক্যান আই বরো আ স্মোক? এক হিসেবে এরা আবার ভিক্ষুকও নয়, ভিখারিরা ধার চায় না,

দান চায়। বিজুর তখন বলতে ইচ্ছে করে, বাবা, ধার তো নিচ্ছো, ফেরত দেবে কীভাবে? তোমার সঙ্গে এ জীবনে কখনো আর দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখি না যে!

বুড়োর লাইটারে সিগারেট ধরিয়ে বিজু বলে, জানো, একবার এক বন্ধুর কাছে দেশলাই চাইলাম। বন্ধু গম্ভীর মুখে বললো, সিগারেট নেই, ম্যাচও নেই, শুধু অভ্যাসটা আছে!

দু'জনে খুব মজা পেয়ে গলা খুলে হাসে। বুড়ির প্রশ্ন, কোথা থেকে আসছো তুমি?

আমি এ শহরেই থাকি, বস্টনে গিয়েছিলাম একটা কাজে।

মুচকি হেসে বুড়ো জিজ্ঞেস করে, কতোদিন ছিলে?

তিনদিন।

তিনদিনে তুমি বস্টনের লোকদের কায়দায় বস্টন বলতে শিখে ফেলেছো দেখছি। টেক্সাসে আমরা বস্টনকে তো বস্টন বলি।

থতমত খেয়ে বিজু বুঝতে পারে, ওর অবস্থা এখন সেইসব মানুষের মতো যারা চোরকে চুর বলে, কিন্তু চোর আর চুর উচ্চারণের তফাৎটা কিছুতেই ধরতে পারে না। বুড়ো বস্টন শব্দটা নিশ্চয়ই দু'রকম করে বলেছে পার্থক্য বোঝানোর জন্যে, কিন্তু তার কানে ধরা পড়েনি। বোকার মতো হাসতে হয়।

বুড়ো আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার দেশ কোথায়? ইন্ডিয়া?

না, বাংলাদেশ।

ওঃ, সেই জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট।

বিজু দেখেছে এ দেশী অপেক্ষাকৃত কম বয়স্করা বাংলাদেশ নামের দেশটি এই পৃথিবীতে নাকি অন্য কোনো গ্রহে - জানেই না। কেউ কেউ নামও শোনেনি। একটু বয়স্করা চেনে জর্জ হ্যারিসনের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর সুবাদে। মনে থাকারই কথা, তাদের যৌবনের উদ্দাম সময়ের ঘটনা! আজকাল যে কোনো অজুহাতে বেনিফিট কনসার্ট করে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের নামে সেই ধারণার শুরু হয়েছিলো, সে কথা ক'জন মনে রেখেছে?

বিজু বলে, হ্যাঁ। সেই বাংলাদেশ।

র‍্যাভি শ্যাঙ্কারের জ্যায় বাংলাও শুনেছি আমি।

জয় বাংলা নামে রবি শঙ্করের কোনো রেকর্ড আছে, বিজু জানতো না। জয় বাংলা বললে তার এক ধরনের অহংকার হয়। এ শুধু আমাদের নিজস্ব, আর কোনো দেশের মানুষের কোনো ভাগ নেই সেখানে। কী ধ্বনিময়, কাব্যিক এবং উদ্দীপক! বিজুর যখন বোঝার বয়স

হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে জয় বাংলা উধাও হয়ে গেছে ততোদিনে, কেউ আর বলে না। যারা এর উদগাতা, তারাও যে কী করে ভুলে গেলো! জয় বাংলা বলে বাঙালি যুদ্ধ করেছিলো, বীরের মতো জয় করেছিলো। এসব তার শোনা কথা, গল্পের মতো। তবু জয় বাংলা তার ভেতরে গেঁথে আছে, প্রকাশ্যে বললে কেউ কেউ খুব অদ্ভুত চোখে তাকায়। অশ্লীল কথা শুনলেও অনেকে ওভাবে তাকাবে না। জয় বাংলা কি এতো অশ্লীল, অস্পৃশ্য, অনুচ্চারণীয়?

এবার বুড়ো অজান্তে তার হাতে একটা লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিয়েছে। সুযোগটা ছাড়ে না বিজু। বলে, আমরা কিন্তু র‍্যাভি শ্যাঙ্কারকে চিনি না, ওঁর নাম রবিশঙ্কর।

বুড়োর মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখে বিজু, একটুও খারাপ লাগে না। এ দেশে এসে প্রথম প্রথম এসব নিয়ে কিছু না বলে চুপ করে থাকতো। এখন সুযোগ পাওয়ামাত্র অপমানটা ফিরিয়ে দেয়। অপমান না তো কী? ওরা আশা করবে ওদের নামধামসহ ইংরেজি সবকিছু ওদের মতো আমরা উচ্চারণ করবো, আর আমাদের নামগুলি যেমন খুশি বলার সব অধিকার ওদের! বাংলাদেশকে বলবে ব্যাংলাডেশ। আবদুলকে অ্যাবডুল। এমন তো নয় যে ওদের ভাষায় দ-এর উচ্চারণ নেই - ফাদার, মাদার বলতেও তো দ লাগে। বাংলাদেশ বলার সময় দ আর মুখে আসে না। যত্তোসব!

বরাবর যা হয়, বিজু তাই হতে দেখে আবার। বুড়োবুড়ির বাস চলে এসেছে। বিজুরটা সবার শেষে আসার কথা – ওর জন্মের আগেই এসব ঠিক হয়ে আছে। জানতে এবং হজম করতে তার একটু সময় লাগছে, এই যা।

আরো খানিক পরে বাসের দেখা মেলে। নীল রঙের বাসের গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা - পার্ক অ্যান্ড ফ্লাই। বিজুর সিগারেট প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো, সুতরাং ফেলে দিতে কষ্ট হয় না। খুবই ধীরে এগিয়ে আসছে বাস, থামবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অগত্যা হাত তুললে বাস থামে। তাড়াতাড়ি উঠে এলে ড্রাইভার জানায়, বিজু ভুল জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলো, ওখানে এই বাসের থামার কথা নয়। ক'দিন আগে ওখানে বাস থামানোর কারণে এক ড্রাইভারকে জরিমানা দিতে হয়েছে।

কী আশ্চর্য! অন্যসব বাস থামার জায়গাতেই সে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার বাসের জন্যে ওটা ভুল জায়গা!

বাসে আরো চার-পাঁচজন যাত্রী। খালি একটা সীটে বসতে বসতে বিজু ড্রাইভারকে জানায়, আমার জন্যে থেমেছো বলে ধন্যবাদ। ভয় পেয়ো না, কাউকে আমি বলতে যাচ্ছি না। শুধু তোমার বসকে একটু না জানালে ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ দেখাবে!

জোরে হেসে ওঠে কৃষ্ণকায় ড্রাইভারটি, ভালো বলেছো কিন্তু!

মিনিট কয়েকের মধ্যে বাস ঢুকে পড়ে পার্ক অ্যান্ড ফ্লাই-এর পার্কিং লট-এ। সারি সারি গাড়ি পার্ক করা। '...চোখে পড়বে মানুষের সাধ্যমতো ঘরবাড়ি...' আল মাহমুদের কবিতার লাইন না? নাকি অন্য কারো? এ দেশে অবশ্য তা সাধ্যমতো গাড়ি। গাড়ি দেখে মানুষের বিত্তের আন্দাজ মেলে, চালককেও খানিক চেনা যায়। বিশ-বাইশ বছরের উদ্দাম যুবক কখনো মার্সিডিস চালাবে না, চালাবে যারা সমাজে স্থিত, আর্থিকভাবে নিশ্চিত। করভেট-এর চালক সশব্দ গতির প্রেমিক। টয়োটা করোলা নিতান্ত মধ্যবিত্তের। মার্সিডিসের গরিবি সংস্করণ লেক্সাস আরেকটু উঁচু জাতের মধ্যবিত্তের বাহন, বিএমডব্লিউ বা জাগুয়ার-এর মালিকরা আভিজাত্যের প্রতিনিধি।

দেশে ফেরিঘাটে যেমন হরেক রকমের দোকানপাট গড়ে ওঠে মানুষের দরকারের কথা মনে রেখে, এখানে এয়ারপোর্টের আশেপাশে পার্ক অ্যান্ড ফ্লাই-এর মতো ব্যবসা ফেঁদে বসে গেছে এরা। মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয় নতুন ব্যবসা। দু'চারদিনের জন্যে বা দিনে-দিনে ফেরার মতো সময়ের জন্যে বিমানযাত্রার সময় এদের জিম্মায় গাড়ি রেখে যাওয়া যায়। পয়সার হেরফেরে খোলা জায়গায় অথবা ছাদঢাকা জায়গায় গাড়ি রেখে যেতে পারো। ওরা নিজেদের বাসে নির্দিষ্ট এয়ারলাইনের টার্মিনালে পৌঁছে দেবে। বাসগুলো এয়ারপোর্টের বিভিন্ন টার্মিনালে সারাদিন টহল দিতে থাকে। ফেরার সময় বাস চিনে উঠে পড়লেই হলো, ফিরিয়ে নিয়ে আসবে নিজেদের পার্কিং লটে।

নিউ ইয়র্কের মতো ট্যাক্সির শহর নয় ডালাস, তবু ফোন করে দিলে সময়মতো পাওয়াও কঠিন নয়। কিন্তু এখানে গাড়ি রেখে গেলে খরচ পড়ে ট্যাক্সিভাড়ার তুলনায় অনেক কম। তিনদিনের জন্যে বিজুর খরচ হবে গোটা পঁচিশেক ডলার। ট্যাক্সিতে বাসা থেকে এয়ারপোর্টে যাতায়াতে পঞ্চাশ-ষাটের ওপর অনায়াসে লেগে যেতো। পঁচিশ-পঞ্চাশে বিজুর নিজের কিছু আসে-যায় না, পয়সা দেবে অফিস।

বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কাউকে বলা যেতো। সময়মতো এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবে, তুলেও নেবে ঠিক। অনেকে বউ বা বন্ধু-বান্ধবের গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাতায়াত করলেও অফিসের কাছে ট্যাক্সিভাড়ার টাকা ঠিক ঠিক বিল করে আদায় করে নেয়। যেসব খরচের জন্যে রসিদ না থাকলেও চলে, ট্যাক্সিভাড়া বা পোর্টারের টিপস সেগুলোর মধ্যে পড়ে। এই কারণে বন্ধুদের অনুরোধ করতে ইচ্ছে করে না বিজুর। তারা ভেবে বসতে পারে, বিজু অফিসের পয়সা পকেটে ঢোকাবে। দরিদ্র দেশের মানুষ হলেও বিজুর কাছে খুব অরুচিকর লাগে এই ক্ষুদ্র অসততা।

বিজু খুব সাধুপুরুষ, এমন নয়। হাতের কাছে মিলিয়ন ডলারের দাঁও পেয়ে গেলে কী হবে বলা শক্ত, কিন্তু এরকম ছিঁচকেমিতে তার রুচি নেই। অফিসের কাজে না হয়ে ব্যক্তিগত

কারণে এয়ারপোর্টে যাতায়াতের দরকার হলে অবশ্য আলাদা কথা। তবু কাউকে বলতে ভালো লাগে না বিজুর। নিজেকে দিয়েই জানে, সবারই ব্যস্ততা আছে, কাজকর্ম আছে। রানুকে বলা যেতো। যেতো কি? নাঃ, হয়তো যেতো না।

ড্রাইভারের হাতে নিজের গাড়ির হদিস লেখা কাগজ ধরিয়ে দিয়েছিলো বিজু। কাগজ দেখে পার্কিং লটে ওর গাড়ির সামনে বাস থামিয়ে দেয় ড্রাইভার। ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে দরজার কাছে আসতে ড্রাইভার বলে, হ্যাভ আ নাইস ডে।

আবার সেই নাইস ডে! দিন যেমনই যাক, ধন্যবাদ দেওয়া রেওয়াজ। বিজুও দিলো।

পার্কিং লট থেকে বেরোনোর পথে একটা খুপরিমতো ঘরে জানালা খুলে বসা এক মহিলা। গাড়ি থেকে নামার দরকার নেই। গাড়ি রেখে যাওয়ার সময় পাওয়া দিন-সময়ের ছাপ মারা কার্ডটা এগিয়ে দেয় বিজু। মহিলা কমপিউটার টিপে বলে দেয়, কতো দিতে হবে। পয়সা মিটিয়ে দিলে সামনে যাওয়ার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

রাস্তায় নেমে এক মিনিটের মধ্যে হাইওয়ে। 'মানুষের সাধ্যমতো ঘরবাড়ি...'। কোন কবিতার লাইন এটা? আগে-পরের লাইনগুলো মনে পড়ে না, শুধু এইটুকু মাথার ভেতরে আটকে আছে! আহ্, কতোদিন কবিতা পড়া হয় না, বিজুর মনেও নেই। মাঝে মাঝে এমন আচমকা একেকটা লাইন কোথা থেকে মাথার ভেতরে ফিরে ফিরে আসে। ক'দিন আগে মনে পড়েছিলো এরকম একটি পংক্তি, '...প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে, মনেও রাখবে না...'। মনে পড়ে না কোথায় পড়েছিলো, কোন কবিতা, কার লেখা।

এবার দেশ থেকে কিছু কবিতার বই আনিয়ে নিতে হবে। ভাবতেই তার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। ভাবা পর্যন্তই। গত বছর নিজে দেশে গিয়েছিলো, ইচ্ছেটা তেমন হলে তখন নিয়ে আসতে পারতো। করবো-করবো করে কতো কিছু করা হয় না, দিনযাপনের বায়না নিয়ে কাটে একটিমাত্র জীবন।

গাড়ির ভেতরে সিগারেট খাওয়া একেবারে বারণ। রানু আজকাল পৃথিবীর ধূমপান নিষিদ্ধকরণ অভিযানের অগ্রসেনানীদের একজন। সুতরাং ওই বিষয়ে বিজুর ওপর যাবতীয় খবরদারির একচ্ছত্র অধিকার তার। অথচ এই রানু বুয়েটে পড়ার দিনগুলোতে বিজুর জন্যে বেনসন অ্যান্ড হেজেস-এর আস্ত প্যাকেট কিনে আনতো। সিগারেট হাতে না থাকলে নাকি ছেলেদের ঠিক পুরুষালি ভাব আসে না। বিয়ের পরেও কিছুদিন নিজের হাতে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া সাংঘাতিক রোম্যান্টিক ব্যাপার ছিলো রানুর কাছে!

হায়, কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেলো, কোথায় কোন কলকব্জা কখন বিকল হয়ে গেলো – জানা হলো না। এখন নাকি সিগারেটের গন্ধে রানুর বমি আসে। ভাবা যায়!

২

আমাকে তুমি বিয়ে করলে কেন?

এই অদ্ভুত ও আচমকা প্রশ্নটি রানু করেছিলো বিয়ের রাতে। পরিচয়ের সময় থেকেই এইসব চমকের সঙ্গে বিজুর পরিচয় হয়েছিলো। এই হাসিখুশি, আবার পরের মুহূর্তে তুচ্ছ কিছু নিয়ে রেগে ওঠা – রানু এরকমই বরাবর। তবু টানা চার বছর প্রেম করার পর বিয়ের রাতে একা হলে বিজুকে বলা রানুর প্রথম বাক্য ওই অদ্ভুত প্রশ্নটি। শুনে মনে হবে, যেন ওর অমতে জোর করে বিয়েটা ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন বা সংশয় দু'জনের কারো ছিলো না। ঝোঁকের মাথায় নয়, ভেবেচিন্তে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে। তাহলে? তবু তখন ছেলেমানুষি বা পাগলামি বলে বিশ্বাস করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো বিজু। সময় যেতে মনে হতে শুরু করে, কী যেন একটা ইঙ্গিত ছিলো সেখানে।

আজও সে ভেবে পায় না কথাটা রানু কেন বলেছিলো। রানু নিজে কি জানে, নাকি বলার ঝোঁকে বলা? অনেকবার জিজ্ঞেস করবে ভেবেছে, কথাটা মুখে আনতে পারেনি বিজু। নাটকে-সিনেমায় দেখে বিয়ের রাতে দু'জনের কথাবার্তা কীরকম হতে পারে তার একটা ধারণা তৈরি হয়েছিলো, তার ধার দিয়েও যায় না এই প্রশ্ন। নাটক-সিনেমা বাস্তব নয়, তাহলে বাস্তব কীরকম? নিজেও আগে কোনোদিন বিয়ে করেনি, করলে আগেরবারের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেতো। বন্ধুদের কেউ তখনো বিয়ে করেনি, করলেও তাদের কাছে কি সে জিজ্ঞেস করতে পারতো? সম্ভবত না, সংকোচ হতো। রানুর সেই প্রশ্ন আজও বিজুর কাছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর, অস্বস্তিকরভাবে অমিমাংসিত।

রানু আজকাল আর বিজুকে বিস্মিত করে না। যে কোনো অপ্রত্যাশিতকে অতি স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে শিখে গেছে সে। অনেক বছরের অভ্যাস! তবু পুরোপুরি অভ্যস্ত হওয়া কি যায়? এখনো রানুর আচমকা আক্রমণ বিজুকে আহত করে, বিষণ্ন করে।

বুয়েটে একই বছরে ভর্তি হয়েছিলো - রানুর আর্কিটেকচার, বিজু ইলেকট্রিক্যালে। তবু রানুকে চোখে না পড়ার কোনো কারণ ছিলো না। সুন্দরী বলে ততোদিনে তার নাম রাষ্ট্র হয়ে গেছে। অনেকের নজরে পড়েছিলো সে। সুন্দরী মেয়েরা লেখাপড়ায় ভালো হয় না বলে একটা তত্ত্ব বাজারে চালু আছে। সেই হিসেব মনে হয় খুব বেঠিক ছিলো না, বুয়েটে সুন্দরী চোখে পড়তো ক্বচিৎ-কদাচিৎ। রানু ব্যতিক্রম, বলতেই হবে।

লাইব্রেরির সামনে একদিন বিজু একা পেয়ে যায় রানুকে। শরৎকালের সকালে রোদের তেমন তেজ নেই। পরিষ্কার নীল আকাশে সাদা মেঘের ওড়াউড়ি। রানুর পরনের শাড়ির

রঙও আকাশী নীল। আকাশ দেখেই পরেছে নাকি? বিজু লাইব্রেরিতে ঢুকতে যাওয়ার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলো, শেষ করে ভেতরে ঢুকবে। রানুকে দেখে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, অনেকটা পথ আগলে ধরার মতো। রানু থমকে দাঁড়িয়েছে।

বিজু বলে, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আমার।

রানুর চোখে জিজ্ঞাসা। কিছু কৌতূহল। আর অবাক হওয়া। একে সে আগে কোথাও দেখেছে? কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না।

চোখের জিজ্ঞাসা মুখে তুলে আনে সে, কথা! আমার সঙ্গে!

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।

ছেলেটি কি ওদের সিনিয়র? না হলে সরাসরি তুমি করে বলার কথা নয়। রানু নিশ্চিত হতে পারে না। বলে, কী কথা?

সরাসরি রানুর চোখে চোখ ফেলে বিজু বলে, তোমাকে আমার চাই।

অপ্রস্তুত রানুর মুখে এসে যায়, মানে?

বিজু ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে দু'হাত নেড়ে বলে, মানে হলো তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। তোমার হয়তো জানা নেই, অবশ্য তোমার কোনো দোষ নেই হয়তো, সব খবর সবাই সময়মেতো পায় না। কিন্তু তোমাকে আমার যেমন চাই, আমাকেও তোমার চাই।

রানু সামলে নিয়েছে। এর নাম প্রেম নিবেদন? এখানে নিবেদন কোথায়? প্রেমই বা কোথায়? এ তো উদ্ভট দাবি। কোনো বইয়ের পাতায়, সিনেমায় এরকম দেখেনি সে। কারো কাছে শোনেওনি। হাসি পেয়ে যাচ্ছিলো, কোনোমতে সামলে গম্ভীর মুখে বলে, আমার কাছে তেমন কোনো খবর আসেনি।

বলেইছি তো, সবাই সবকিছু সময়মতো জানতে পারে না। হয়তো পরে জানবে।

না জেনে আমার কোনো ক্ষতিও হয়নি।

কিন্তু তোমাকে না হলে যে আমার চলবে না!

স্পষ্ট করে রানু বলে, আমার চলবে।

তুমি ঠিক জানো না।

এবার স্পষ্টতই বিরক্ত রানু, চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে।

বলে, আশ্চর্য আপনাকে আমি চিনিও না!

বিজু সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো করে বলে, আপনি নয়, তুমি।

আপনার মতো অচেনা কাউকে তুমি করে বলতে শিখিনি আমি।

কঠিন কিছু নয়, শিখে নিলেই হয়।

না শিখে আমি বেশ আছি।

থাক, ওসব পরে। আমি ক্যান্টিনে যাচ্ছি চা খেতে। এসো।

রানু অনায়াসে না বলতে পারতো। বলা স্বাভাবিক ছিলো। বলে না, কৌতুক বোধ করছিলো সে। ছেলেটিকে দু'একবার দেখেছে বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আলাদা করে মনে রাখার কোনো দরকার হয়নি। উপলক্ষও নয়। এখন হলো।

চা নিয়ে একটা খালি টেবিলে সামনাসামনি বসে বিজু বলে, তোমার কথা শোনার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই, কী বলো?

জবাব দেওয়ার কিছু নেই, চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বিজুর মুখের দিকে তাকায় রানু। তার কৌতূহল হচ্ছে। কৌতূহলে নাকি বিড়াল মারা পড়ে। নাঃ, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে তার, সে মারা পড়বে না।

আমার নাম বিজু। পুরো নাম জানাতে পারি, আপাতত তার দরকার দেখছি না। পড়ি ইলেকট্রিক্যালে, তুমি আর্কিটেকচারে, আমি জানি। একই ব্যাচে। ইস্কাটনে পৈত্রিক বাড়িতে থাকি, দুই ভাই, আমি ছোটো। বড়ো ভাই পাঁচ বছরের বড়ো, বুয়েট থেকে পাশ করেছে, এখন বউ আর এক ছেলে নিয়ে থাকে সুইডেনে। বাবা সরকারি চাকরিতে, মা সংসারে। আর আমার নিজস্ব কথা, কবিতা পড়তে আর সব ধরনের গান শুনতে ভালোবাসি। ক্লাস করার চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেশি ভালো লাগে। কলেজে পড়ার সময় একটা মেয়ের সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্বমতো হয়েছিলো, প্রেমট্রেম পর্যন্ত যাওয়া যায়নি। এ ছাড়া আর কোনো অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে মেলমেশা করিনি। এই তো আমি, এবার তোমার কথা বলো।

রানু কী বলবে, তার অবাক হওয়া যে ফুরায় না! কেউ এভাবে আলাপ-পরিচয় করতে পারে! এইমাত্র যার নাম জানা হলো, সেই বিজু নামের ছেলেটিকে তার ভালো বা মন্দ কিছুই লাগছে না। তার নিজের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত বা যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা সঙ্গত কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

রানু বলে, আমার কোনো কথা নেই।

তার মানে তোমার নামধামও কিছু নেই!

তা আছে, কিন্তু সেগুলো আপনাকে জানানো দরকার বলে আমার মনে হয় না।

কেন দরকার নেই?

দরকার নেই, ব্যস।

তার মানে এই যে আমরা এক টেবিলে চা নিয়ে বসেছি, এরও কোনো মানে নেই?

রানু বলে, নেই মনে করলে নেই। আপনি চা খেতে বললেন, এসেছি। এই তো।

বিজু হাসে, যে কেউ ডাকলেই বুঝি তুমি চা খেতে যাও?

রানুর রেগে যাওয়া উচিত। রীতিমতো অপমানজনক! সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসা রানুর জন্যেও একেবারে নতুন। কেন এলো তা নিজেও জানে না, যেন ঘোরের মধ্যে চলে এসেছে। সে কোলের ওপর রাখা ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বলে, স্যরি। ভুল করে ফেলেছি।

বিজু কিছু বলার আগেই রানু টেবিল ছেড়ে চলে গেছে।

সেই প্রথমদিনের ঘটনার পরে সম্পর্কটা যে বিয়ে পর্যন্ত যেতে পেরেছিলো, তা-ও বিজুর পাগলপারা একগুঁয়েমির কারণে। রানু টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়ার পর নিজেকে তার নিতান্ত ক্যাবলাকান্ত মনে হচ্ছিলো প্রথমে। জানে, আশেপাশের টেবিল থেকে কেউ কেউ ওকে লক্ষ্য করছে। সামলে নেয় কয়েক মুহূর্তে। চায়ের কাপে দু'চুমুক দিয়ে একটা মেয়ের এভাবে টেবিল ছেড়ে উঠে যাওয়া যেন খুব স্বাভাবিক – এরকম মুখ করে ধীরেসুস্থে চায়ের কাপ তুলে নেয়।

চা শেষ করে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। '...ইউ গট লাকি বেব, হোয়েন আই ফাউন্ড ইউ...'। মনে পড়ে, মেয়েটা তার নাম বলেনি। না বলুক, ওর নাম সে জানে।

পরদিন, তার পরদিন এবং তার পরদিন ক্রমাগত রানুর ডিপার্টমেন্টে উপর্যুপরি হানা দিতে থাকে বিজু।

রানু চোখমুখ কুঁচকে বলে, নির্লজ্জের মতো আসেন কেন?

বিজুর জবাব, তোমাকে আমার চাই। কতো কোটিবার আমাকে ফেরাবে তুমি? একসময় তোমাকে হ্যাঁ বলতেই হবে।

এরকম বিশ্বাস থাকা ভালো। রানু গলায় ঠাট্টা স্পষ্ট।

রানু, পুরুষমানুষের কাজ হলো লক্ষ্যস্থির করে তাকে জিতে নেওয়া। সেজন্যে বিশ্বাস কিছু লাগেই।

৩

সিগারেট নিয়ে মেয়ের আপত্তি মায়ের থেকে আরেক কাঠি ওপরে। ফুলটুস জন্মানোর কয়েক মাস আগে থেকে ঘরে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো বিজু। বাইরে গিয়ে খায়। শীতের সময় যখন বরফে চারদিক সাদা হয়ে আছে, তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় পর্যন্ত জমে যাওয়ার অবস্থা, তখনো বাইরে বারান্দায় যেতে হয়। তবু রেহাই নেই, টের পেলে ফুলটুস তেড়ে আসবে। ছুঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত একটানা বলতে থাকবে, বাবা তোমাকে না বলেছি আর সিগারেট খাবে না। ফেলে দাও। কী হলো, শুনছো না! বলেছি না, সিগারেট খেলে তোমার অসুখ হবে, অসুখ হলে তুমি মরে যাবে। এক্ষুণি ফেলে দাও বলছি...

স্কুলে শেখা। গতবছর স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে সে, তখন থেকে শুরু। হাট্টিমা টিম টিম শেখার বয়সে আজকাল বাচ্চাদের ধূমপানের, ড্রাগের জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলা হয়। কী হতো আরো দু'চার বছর পরে এসব তাদের মাথায় ঢোকালে? শিশুদেরও আর এজ অব ইনোসেন্স বলে কিছু থাকবে না!

সিগারেট নিয়ে, ড্রাগস নিয়ে কতো কথা, অথচ প্রসেস করা গোমাংসের নামে যে বিষ দিয়ে বারগার তৈরি হয়, তা-ও আবার স্কুলে লাঞ্চের সময় দুধের বাচ্চাদের জন্যে অনায়াসে হালাল। এই নিয়ে কেউ কথাটিও বলে না। টিভিতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, কমবয়সী ছেলেমেয়েরা নাকি তাতে সিগারেটে আসক্ত হতে উৎসাহী হয়। বীয়ার-হুইস্কির বিজ্ঞাপন অবশ্য অনায়াসে অবাধে চলতে পারে, ওগুলো টিভিতে দেখানোর সময় সম্ভবত বাচ্চারা চোখ বন্ধ রাখে অথবা ওসবে বোধহয় আসক্ত হওয়ার কিছু নেই!

হাইওয়েতে এখন তেমন ভিড় নেই। সূর্যের শেষ আলোও নিভে আসছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে নব টিপে রেডিও চালু করে বিজু। ট্রাফিক রিপোর্ট হচ্ছে একটা স্টেশনে, শহরের কোন রাস্তায় ট্রাফিক কেমন, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট বা রাস্তা মেরামতের কারণে ট্রাফিক জ্যাম তার বিবরণ। দু'একটা রেডিও স্টেশনের নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে, সেগুলো সকাল-বিকেল রাশ আওয়ারে শহরের ওপর চক্কর দিয়ে রিপোর্ট করে, সেগুলো খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য। বাদবাকি স্টেশনগুলোগুলোর ট্রাফিক রিপোর্ট শোনার দরকার নেই, বেশিরভাগ সময়ই পুরনো খবর। এমনও হয়েছে, যে রাস্তায় বা ইন্টারসেকশন বন্ধ বলা হচ্ছে বিজু ঠিক সেখানেই তখন। কোথায় বন্ধ, কোথায় কী! গাড়িগুলো দিব্যি চলছে যেমন চলার কথা।

বিজু অন্য স্টেশন ধরে, সেখানে গাড়ির বিজ্ঞাপনের নামে তারস্বরে চিৎকার। পরেরটাতেও বিজ্ঞাপন, ভায়াগ্রার বিকল্প ওষুধের খবর। চার নম্বরে এসে পছন্দমতো একটা গান পেয়ে যায়, 'ইউ ডোন্ট নো হাউ ইট ফীলস্ টু বি মি...'।

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে একটা দোকানে থামতে হয়, ফুলটুসের জন্যে বড়ো বারবি পুতুল কেনে বিজু। কে জানতো বাবা হলে মেয়ের পুতুলের হিসেবও রাখতে হবে! এমন একটা পুতুল চাই যেটা ওর সংগ্রহে নেই। কতো রকমের যে বারবি তার তো কোনো হিসেব করা সম্ভব নয়। জিপসি বারবি, সাঁতারু বারবি, প্রিন্সেস বারবি আর ফ্যাশন বারবির পাশাপাশি তাদের ব্যবহার্য খেলনা গাড়ি, ফোন, রেডিও। একই বারবিকে অনেক সাজে সাজানোর জন্যে হরেক রকমের পোশাক, নেইল পলিশ, কানের দুল সব প্যাকেট করে ঝুলিয়ে রাখা।

ফুলটুসের এখন সেই বয়স যে বয়সে এ দেশে বড়ো হওয়া মেয়েরা বারবি-জ্বরে পড়বে, তৈরি হবে তার হরেক রকমের বারবির সংগ্রহ। কার সংগ্রহে কতোগুলো বারবি, এই নিয়ে তাদের প্রতিযোগিতা। এখনকার দাদী-নানীরা যে বয়সে বারবি খেলেছে, এখন নাতনিরাও সেই বয়সে বারবির জন্যে একই রকম পাগল হয়।

ফুলটুসের বায়না ছিলো, বস্টন থেকে বড়ো একটা বারবি আনতে হবে। ফরমায়েশটা শাস্তিমূলক। বস্টন যাওয়ার দিন সকালে যথারীতি ওকে স্কুলে নামাতে গিয়েছিলো বিজু। স্কুলে যাওয়ার পথে মেয়ে আর সব দিনের মতো একটানা বকবক করে যাচ্ছিলো – সূয্যিমামা কেন চোখে ঝাল দিয়ে দিচ্ছে, দুষ্টু সূয্যিমামাকে খুব করে বকে দিও তো, বাবা!

স্কুলে যাওয়ার পথের পাশে একটা ঝাঁকড়ামতো গাছকে সে নিজস্ব গাছ বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, গাছের পাতাগুলো এই সময়ে কেন ঝরে যাচ্ছে জাতীয় প্রশ্নও চলছিলো। এক ফাঁকে বিজু বলেছিলো, মামণি, আজ দুপুরে বাবা বস্টনে যাচ্ছে। তুই স্কুল থেকে ফেরার আগেই চলে যাবো, ফিরবো তিনদিন পরে। তোর জন্যে কী আনতে হবে?

মেয়ে খুব উদারভাবে তখন বলেছিলো, কিচ্ছু আনতে হবে না।

বস্টনে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছে বাসায় ফোন করে জানা গেলো কাহিনী ভিন্ন মোড় নিয়েছে। কেঁদেকেটে মেয়ে বাড়ি মাথায় তুলেছে – বাবা কেন তাকে বলে যায়নি! ফোনে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষমেষ আসামী বাবার শাস্তি ধার্য হয়, বড়ো একটা বারবি কিনে নিয়ে যেতে হবে। ফিরে এসে কিনে দিলে চলবে না, বস্টন থেকে আনা চাই।

কাল সন্ধ্যায় হাতে কিছু সময় ছিলো। একটা খেলনার দোকানে ঢুকেওছিলো বিজু, কেনেনি। অতো বড়ো পুতুল ব্যাগে ঢুকবে না। হাতে করে বয়ে আনারও কোনো মানে হয় না। ঠিক করে রেখেছিলো, বাসায় ফেরার পথে কিনে নেবে। মেয়ে না জানলেই হলো।

দোকান থেকে বেরিয়ে আচমকা মনে পড়ে, সেলফোনটা এখনো অন করা হয়নি। প্লেনে উঠে সুইচ অফ করে রেখেছিলো, এখনো ওই অবস্থায় আছে। অন করে দেখে, মেসেজ আছে। একটা মেসেজ, ফুলটুসের – বাবা, তুমি এখনো আসছো না!

বাসায় পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। রানু রান্নাঘরে। দরজা খোলার শব্দে উঁকি দিতে বিজুর সঙ্গে চোখাচোখি। মুখের কোনো রেখা একটুও বদলায় না। চোখ নামিয়ে সিঙ্কে রাখা কাপ-গ্লাসগুলো ধোয়ায় ব্যস্ত হয়ে যায় রানু। বিজু বস্টন যাওয়ার দিন দুয়েক আগে থেকে রানুর সঙ্গে হিসেব করা কথা চলছে। যতোটুকু না হলে নয়, তাই আর কি। বস্টন থেকে প্রতিদিন একবার করে ফোন করেছে বিজু। ঠিক রানুর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ থেকে নয়, ফুলটুসের জন্যে।

খানিকটা দায়িত্ব পালনও বটে। না করলে এই নিয়েও কথা শুনতে হবে, আমাদের খবরে তোমার কোনো দরকার আছে নাকি!

একসময় ফুলটুসের ফোনে কথা বলার নেশা হয়েছিলো খুব, ফোন বাজলে ওকেই ধরতে হবে। কোত্থেকে ছুটে এসে সবার আগে ফোন তুলে নিতো। আজকাল ফোনের দিকে তাকিয়েও দেখে না। সুতরাং বিজু ফোন করলে রানু ধরেছে। বিজুর তোমরা কেমন আছো-র উত্তরে রানু সংক্ষেপে বলেছে, ভালোই তো।

সব ঠিকঠাক?

হ্যাঁ।

ফুলটুসের কথা বলো, শুনি।

এই যে ধরো, দিচ্ছি।

রানু ফোন তুলে দিয়েছে ফুলটুসের হাতে।

বিজু আড়চোখে দেখে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ রানুকে। এমনিতে ঘরে সাজগোজ দূরে থাক, মাঝেমধ্যে এমন একেকটা কাপড় পরে থাকে যে, দেশে হলে যে কেউ তাকে কাজের মেয়ে ভেবে বসবে। অফিসে যাওয়ার সময় সে সামান্য সাজগোজ করে, কোনো বিয়েবাড়ি-জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও যত্ন করে সাজে। কিন্তু বাসায় সে যে কেন এমন জবরজং হয়ে থাকে, কে জানে!

অনুযোগ করলে দু'চারদিনের জন্যে একটু অন্যরকম হয়। তারপর আবার যে কে সেই। মনে হতে পারে, বিজুর কাছে নিজেকে অনাকর্ষণীয় করে তোলাই তার জীবনের সাধনা! অথচ সামান্য একটু যত্নে রানু যে কী সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, হয়তো সে জানেও না। বিজু সামান্য অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, আজ একটুখানি সেজেছে রানু।

ঘরে সাধারণত শাড়ি পরে না, খুব নাকি ঝামেলা। বিজু তাকে শাড়িপরা দেখতে পছন্দ করে বলে হয়তো। আজ কলাপাতা রঙের একটা শাড়ি পরা, শাড়িটা আগে দেখেছে বলে

মনে করতে পারে না। নতুন কিনেছে? লম্বা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ঠোঁটে কি একটু লিপস্টিক দিয়েছে? ঠিক বোঝা যায় না এতোদূর থেকে। কী মনে করে? বিজু ফিরবে তাই?

রানুকে কিছু বলার উৎসাহ হয় না বিজুর। তিনদিন পরে ঘরে ফিরে ছোট্টো একটা কোনো সম্ভাষণ কিংবা সামান্য এক টুকরো হাসিও কি সে পেতে পারে না? একটা জলজ্যান্ত মানুষ ঘরে ঢুকলো, রানুর চাউনিতে, মুখের রেখায় তার স্বীকৃতিটুকুও নেই। সেই মানুষটি যদি তার মেয়ের বাবা হয়, তার জীবনের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িত হয়ে থাকে – সে সামান্য মনোযোগ দাবি করতেই পারে। পারে না? বাতিল করা না হোক, অন্তত পুরনো প্রেমিক হিসেবেও? সেই ভালোবাসা নিষ্পত্র বৃক্ষের মতো শূন্য হয়ে তো যায়নি। গেলে এক ছাদের নিচে বাস করা সম্ভব হতো না।

বিজু টের পায়, ভালোবাসা আজও আছে, বোতলবন্দী দৈত্যের মতো। জাদুর প্রদীপে হাত বোলানোর কায়দাটাই শুধু ভুল হয়ে যাচ্ছে।

শুধু রানুর দোষ হবে কেন? বিজু নিজেও কিছু বলেনি, একটা শব্দও নয়। বিজু জানে, ভব্যতার খাতিরেও কিছু একটা বলা উচিত। রাগ-অভিমান করে কথা বন্ধ করে রাখা শিশুদের মানায়, সে বয়স কবে গত হয়েছে! কয়েক ফুট দূরত্বে দু'জন কেউ কাউকে যেন চেনে না। আগন্তুকের মতো।

ঠিক তাও বোধহয় নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিতরাও পরস্পরকে হাই বলে সম্ভাষণ জানায় এ দেশে। কেমন আছো বলাও সাধারণ রেওয়াজ। দিনের শেষে ঘরে ফেরার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে নিয়ম করে জিজ্ঞেস করে, দিনটা কেমন গেলো তোমার?

হয়তো কথার কথা, তবু দরকারি। কথা শুরুর একটা ভূমিকা তো বটে। প্রাচ্যদেশীয় বংশোদ্ভূত পুরুষরা অবশ্য সংস্কার বা অভ্যাসবশে হয়তো তাকে বাহুল্য জ্ঞান করে। বিজু জানে, এই অহমের কোনো মানে নেই। তবু জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, অভ্যাস যায় কী করে? খুব সহজ নয়।

এ দেশীয় সহকর্মীদের দেখেছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই তার প্রিয়জনের সঙ্গে ফোনে কথা শেষ করে আই লাভ ইউ বলে। ভারি লোকদেখানো আর ফাঁপা মনে হয় বিজুর। দিনে পঞ্চাশবার ভালোবাসি বললেই ভালোবাসার বৃক্ষ মহীরূহ হয়ে ওঠে না। হলে এদের সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ডালভাতের মতো সহজ ও অনায়াস হতো না।

লেখাপড়া করতে আসা বিজুর চেনা বাঙালি ছেলে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছে। ভালোবাসাবাসির কোনো ব্যাপার ছিলো না। ছেলেটি স্পষ্ট বলেছিলো একদিন, বোঝলেন বিজু ভাই, বিয়াখান করছি পাত্তির লাইগা। খালি গ্রীনকার্ড হইয়া লউক, লাথি মাইরা ওই

সাদা চামড়ারে খেদাইয়া দিমু। তারপর দ্যাশে গিয়া রিয়াল বিয়া কইরা লইয়া আসুম, দেইখেন। অহন তো কিছু করার নাই, খালি উঠতে-বইতে আই লাভ ইউ মুখস্থ কই।

বসার ঘরে টিভিতে কার্টুন নেটওয়ার্কে ফ্লিন্টস্টোন্‌স্। কার্টুন দেখতে বসলে মেয়ের আর কিছু খেয়াল থাকে না। তখন তার চোখের পলক পড়ে না, ছবিগুলো সব গিলে খেতে থাকে। ঠিক পাশেই বোমা ফাটলেও বুঝি চোখ ফেরাবে না। আজ অবশ্য অন্যরকম। দরজা খোলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে। বাবা আসবে বলে বোধহয় কান খাড়া করে রেখেছিলো। ছুটে এসে কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে, তুমি আমাকে বলে যাওনি কেন বাবা? ভুলে গিয়েছিলে?

ব্যাগ দুটো কোনোমতে নামিয়ে রেখে বিজু সোফায় বসতে বসতে বলে, হ্যাঁ রে, ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।

ঠিক তো?

ঠিক।

আমার বারবি কোথায়? এনেছো?

বিজু মাথা চুলকে বলে, এই যাঃ, এক্কেবারে ভুলে গেছি যে!

প্রায় চিৎকার করে ওঠে ফুলটুস। কেঁদেই ফেলবে নাকি! বলে, তুমি একটা পচা বাবা। খুব পচা বাবা।

বিজু হাসতে হাসতে বলে, চল দেখি গাড়িতে বারবিটা এসে বসে আছে কি না।

মেয়েকে কোলে করে গাড়িতে ফিরে যায় বিজু। সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসিয়ে রাখা বারবির গোলাপি রঙের বাক্সটা দেখতে পেয়েছে ফুলটুস। কোল থেকে সড়াৎ করে নেমে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে সে। বারবি কোলে করে ফিরে আসে, বাবা, তুমি ভুল কথা বলেছো কেন?

বিজুর ধারণা শিশুদের মুখে মিথ্যে শব্দটা ভারি বেমানান আর রূঢ়। প্রথম থেকেই ফুলটুসকে শেখানো হয়নি সেটা। তার বদলে ফুলটুস শিখেছে ভুল কথা।

কী ভুল কথা বলেছি রে বুড়ি?

এমনিতে বুড়ি বললে ফুলটুস রেগে যায়। বলে, আমি বুড়ি না, আমার সাদা চুল নেই।

আজ বারবির ঘোরে আছে সে এখন, হয়তো খেয়াল করেনি। বলে, বারবিকে গাড়িতে রেখে এসে আমাকে বলেছো, তুমি ভুলে গিয়েছো! একা একা বারবি ভয় পাবে না!

মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে বিজু। বাক্সবন্দী বারবিকে উদ্ধার করে মেয়ের হাতে দিতে হয়। সোফায় বসে বলে, বারবি তোর পছন্দ হয়েছে রে?

ঘাড় নেড়ে ফুলটুস জানায়, হ্যাঁ, হয়েছে।

এই ক'দিন বাবাকে মিস করেছিলি?

হ্যাঁ।

কতোটা?

হাত দুটো দু'দিকে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে ফুলটুস টের পায়, বগলের তলা থেকে বারবি পড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে পুতুলটাকে আবার জড়িয়ে ধরে বলে, অনেক।

বারবিকে কোলে ফেলে ফুলটুস বাবার সঙ্গে বকবক করে যায়। জানো, স্কুলে টিচার আমাকে স্মার্ট গার্ল বলেছে। মা কাল গোসল করাতে গিয়ে আমাকে ব্যথা দিয়েছে, আমি অনেক কান্না করেছি। মাথায় শ্যাম্পু করার সময় চোখে ঝাল দিয়ে দিয়েছে।

বিজু বলে, জানিস আমি যখন তোর মতো ছোটো ছিলাম, মা গোসল করাতে গেলেই আমি কাঁদতাম।

ফুলটুস হি হি করে খুব এক চোট হেসে নিয়ে বলে, ও মা তুমি কান্না করতে, বাবা?

কেন রে, বাবা বুঝি কাঁদতে পারে না!

বড়োরা আবার কাঁদে নাকি!

হ্যাঁ, বড়োরাও কাঁদে। খুব কাঁদে। না কাঁদলে বড়োদের চোখের পানিগুলো কোথায় যাবে বল তো? আর আমি তো তখন তোর মতো ছোট্টো। আমার মা সাবান ঘষে দেওয়ার সময় এতো জোরে জোরে ডলে দিতো, মনে হতো গায়ের চামড়াই বুঝি তুলে ফেলবে। সে যে কী দুঃখের, তুই বুঝবি না।

এতোক্ষণে রানুর গলা শোনা যায়। রান্নাঘর থেকেই মেয়েকে বলে, ফুলটুস এখন বাবাকে জামাকাপড় বদলাতে দাও। আর তোমাকে এখন বিছানায় যেতে হবে, কাল স্কুল আছে না!

বাবার সঙ্গে আর একটুখানি কথা আছে মা!

তোমার বকবক কী আর থামবে?

ফুলটুস ঘাড় ঘুরিয়ে মা-কে পাঁচ আঙুল তুলে দেখায়, আর ঠিক পাঁচ মিনিট। বাবার সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে তো।

বিজু যেখানে বসেছে, সেখান থেকে রানুর মুখের আধখানা দেখা যায়। বাকি অর্ধেক আড়াল হয়ে আছে রান্নাঘর আর বসার ঘরের মাঝখানের আধখানা দেয়ালের আড়ালে। ফুলটুসের কথার জবাব না দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে সে।

রানু ফুলটুসকে তুমি করে বলে। বিজু কিছুতেই পারে না, তুই করে না বললে মনে হয় নিজের মেয়ে নয়, আর কারো সঙ্গে কথা বলছে সে। রানু আগে ভুরু কুঁচকে বলতো, মেয়ের সঙ্গে ওরকম অশিক্ষিতদের মতো তুই-তোকারি করে কথা বলো কেন?

বিজু অবাক হয়ে গিয়েছিলো, তুই-তোকারি শুধু অশিক্ষিত চাষাভূষারা করে! আশ্চর্য তো! কথাটা তার কাছে এমনই নতুন, অবান্তর ও আচমকা যে পাল্টা কোনোকিছু চট করে মুখে আসে না। আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য হয়েছিলো সে।

বুয়েটে দু'জনের ডিপার্টমেন্ট আলাদা ছিলো, তখন কোনো বিষয়ে অমিলের খবর পাওয়া যায়নি! পছন্দ-অপছন্দের মিল হলে সম্পর্কটা প্রেম-ভালোবাসার দিকে গড়ায়। এখন পেছন ফিরে কি একটু কাটাছেঁড়া করে দেখা যায়? সত্যি সত্যি মিল ছিলো, নাকি মিল আছে বলে বিশ্বাস করতে তখন ইচ্ছে করতো? ঘোর লাগার ব্যাপার? নাকি বয়সে দু'জনেই বদলে গেছে, আগের মতো আর নেই!

এমনও তো হতে পারে, প্রেম করার দিনগুলোতে যা কিছু জরুরি আর পছন্দের মনে হয়, সংসারে ঢুকলে সেসব ফালতু, অপ্রয়োজনীয়। অন্যভাবে দেখলে, প্রেম করার দিনগুলোতে ফুল-পাখি-চাঁদ খুব জরুরি, বিয়ের পরে যেমন বাজারের ফর্দ। এটাও ঠিক, দু'চার ঘণ্টা একসঙ্গে থাকার সময় খুব সতর্কভাবে নিজেদের দুর্বলতা, খারাপ অভ্যাসগুলো আড়াল করে রাখা সম্ভব। এমনকী প্রেমিকা সঙ্গে থাকলে প্রেমিকপুরুষ হিসি পেলেও চেপে রাখে। দাম্পত্য সেই আড়ালগুলোকে ছিঁড়ে প্রকাশ্য করে দেয়।

পরে আরেকদিন কথা উঠতে বিজু বলেছিলো, দেখো রানু, আমার মেয়েকে তুই করে না বললে আমার তৃপ্তি হবে না। তোমার পছন্দ না হলে কিছু করার নেই, আমি পাল্টাতে পারবো না।

রানু ফোঁস করে উঠেছিলো, আমি বললে পারবে কেন?

বিজুর বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো, কেউ বললেই পারবো না।

বিজু দেখেছে, কথা কাটাকাটির সময় রানু খুবই প্রতিভাময়ী হয়ে উঠতে পারে। তার স্মরণশক্তি তাকে তখন চমৎকার সাহায্য করে থাকে। বাসার বিভিন্ন জায়গায় চার-পাঁচটা বাজারের ফর্দ তৈরি করে সে, অথচ বাজারে গিয়ে দেখা যায় একটাও সঙ্গে আসেনি। গাড়ির চাবি কোথায় রেখেছে মনে করতে পারে না কখনোই। কিন্তু এইসব কথা কাটাকাটির সময়

পাঁচ-সাত বছর আগের কোনো একটা তুচ্ছ কথা ঠিক সময়মতো তুলে এনে তাকে বিষাক্ত ছোবলের মতো ব্যবহার করতে পারে। তার প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন দেখায় সে যখন সম্পূর্ণ মনগড়া একটা কথাকে সত্যিকারের ঘটনা বলে সাজিয়ে বিবৃত করে।

বিজু কথা কাটাকাটির সময় উপযুক্ত পাল্টা কথা মনে আনতে পারে না, কথা খুঁজে না পেয়ে তোতলাতে থাকে। শেষ হলেও তার রেশ থাকে অনেকক্ষণ, বিজু সেই কথাগুলো মনে মনে রিপ্লে-র মতো করে বাজায়। ঠিক সেই সময় রানুর কোনো কথার উপযুক্ত জবাব মনে এসে যায় – কোনো ঘটনা। মনে পড়ে অনেক আগে বলা রানুর কোনো একটা কথা যা এই তর্কের সময় কাজে লাগানো যেতো। ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আবার নতুন করে শুরু করা যায় না! বিজুর ইচ্ছে হয় না। সে বুঝে গেছে, দাম্পত্য বিতর্কযুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয় তার একমাত্র ও অনিবার্য নিয়তি।

বিজু জানে বলেই সে ফাঁদ এড়িয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলো, একটা কথা কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো। তোমার বাবাও মাঝে মাঝে তোমাকে তুই করে বলেন, আমি নিজে শুনেছি।

এর উত্তরও বিজুর কাছে অভিনব। রানু বলে, এখানে আমার বাবার কথা আসছে কেন?

কী আর করা, সাদা চোখে স্পষ্ট জিনিসটাও যে দেখতে অস্বীকার করে, তার সঙ্গে কথা বাড়ানোর মানে হয় না। তার মনে হয়েছিলো, তুলনাটা খুবই সমান্তরাল এবং প্রাসঙ্গিক। এরপরে অবশ্য রানু এই প্রসঙ্গ আর কোনোদিন তোলেনি। তবে সময় বয়ে যায়নি, দু'বছর পরে আবার হয়তো এটাকেই ঠিক ঘাড়ে ধরে ফিরিয়ে আনবে রানু। লড়াইয়ে কোন অস্ত্র কখন কাজে লেগে যায়, কে বলবে! বিজু কোথাও একবার পড়েছিলো, পুরুষমানুষের একজন বউ থাকে কটু কথা বলার জন্যে, যাতে জীবন একেবারে পানসে আর একঘেয়ে না হয়ে যায়!

বিজু মেয়ের লম্বা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, তুই খেয়েছিস রে ফুলটুস? নাকি আমার সঙ্গে খাবি?

বলে বুঝতে পারে, খুব বাজে শট খেলে একখানা মোক্ষম ক্যাচ সে তুলে দিয়েছে। হয়তো এক্ষুণি শুনবে, হ্যাঁ, তুমি না থাকলে তোমার মেয়েকে আর কে খাওয়াবে!

সেরকম কোনোকিছু অবশ্য শোনা যায় না, একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বিজু। ফিল্ডারের অমনোযোগের সুযোগে লাইফ পাওয়া আর কি!

ফুলটুস বলে, হ্যাঁ খেয়েছি।

কি খেলি আজ রাতে?

ভুলে গেছি।

বিজু বুঝলো, খাওয়ার সময় কার্টুন দেখছিলো। রানু খাইয়ে দিয়েছে। কার্টুন চালু থাকলে কী মুখে যাচ্ছে, কে খেয়াল করে! চোখ ফেরালে কিছু একটা মিস হয়ে যেতে পারে।

তুই যে বললি বাবার সঙ্গে কী কথা আছে!

বাবা, আমার ছোটোবেলার কথা বলো।

তোর আবার ছোটোবেলা বড়োবেলা কীসের! তুই তো এখনো ছোটো।

না এখনকার কথা নয়, যখন আরো ছোটো ছিলাম।

বিজু হাসতে হাসতে বলে, শুধু অ্যাঁ অ্যাঁ করে কান্না করতি, কথা বলতে শিখিসনি তখন।

না, তখনকার কথা নয়। ওই যে হামটি-ডামটির গল্পটা বলো।

ফুলটুসের তখন ভালো করে কথা ফোটেনি, ক্যাসেটে শুনে শুনে হামটি-ডামটি শিখেছিলো। হামটি-ডামটি বলতে পারতো না, বলতো ঠামটি-ঠামটি। আর পুট টুগেদার এগেন লাইনটা বুঝতে না পেরে তার কানে যেরকম পৌঁছতো সেভাবেই বলতো, পুটুরেগেন। বিজু জিজ্ঞেস করতো, পুটুরেগেন মানে কি রে? বললেই রেগে যেতো ফুলটুস। সেই কাহিনী তার বারবার শোনা চাই, আর শুনে হাসিতে গড়াগড়ি।

হামটি-ডামটি পর্ব শেষ হলে ফুলটুসের নতুন বায়না, এবার একবার স্নো হোয়াইটের কথা বলো বাবা।

ফুলটুসকে ডিজনির স্নো হোয়াইট ভিডিও কিনে দিয়েছিলো বিজু, ওর তখন তিনও হয়নি। সেই ভিডিও সে সারাদিনমান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতো। আসলে গিলতো। রানীর প্ররোচনায় স্নো হোয়াইটকে বনের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জল্লাদের ছুরি উঁচিয়ে ধরার দৃশ্য এলে ফুলটুস চোখ বুঁজে চিৎকার করে উঠতো, মারবে না, মারবে না। ডাইনিরূপী রানীর হাত থেকে স্নো হোয়াইট বিষাক্ত আপেল নিয়ে মুখে তুলছে দেখলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে ফুলটুস, না খাবে না, খাবে না।

বিজু জানে, গল্পের রশি এখুনি না গোটালে ফুলটুস টেনে টেনে তাকে লম্বা করতে থাকবে। রানুর তাগাদা আবার জারি হওয়ার আগেই উঠে পড়া দরকার।

সে বলে, এখন যে ঘুমাতে হবে তোকে।

আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

না পেলেও ঘুমাতে হবে। কাল স্কুল আছে না!

ফুলটুস বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আজ আমি তোমার সঙ্গে ঘুমাতে যাবো।

এই বায়নাটা মাঝে মাঝে করে সে। নিজের ঘরে ঘুমায় ফুলটুস, কোনো কোনো রাতে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত মাকে না হয় বাবাকে তার সঙ্গে গিয়ে শুয়ে থাকতে হয়।

বিজু কিছু বলার আগেই রানু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার অনুমান ঠিক, রানু হালকা করে লিপস্টিক মেখেছে। কী একটা সুগন্ধিরও সুবাস পাওয়া যায়। নিজের বউ বলে নয়, সত্যিই খুব সুন্দর লাগছে ওকে। বছরখানেক হলো রানু চশমা নিয়েছে, চশমায় ওকে খুব মানায়। আলাদা এক ধরনের ব্যক্তিত্ব ফোটে। হয়তো আরেকখানা মুখোশ।

রানুকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে চুমু খাওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছেকে শাসন করে সে। ফুলটুস উপস্থিত আছে বলে নয়, ঘরের আবহাওয়া ফুরফুরে থাকলে চুমুটুমু পর্যন্ত ওর সামনেই চলতে পারে।

রানু দু'চারবার আপত্তি তুলেছে, মেয়ে বড়ো হচ্ছে না!

বিজুর যুক্তি, টিভিতে সারাক্ষণই দেখছে, এমনকি কার্টুনেও। আমার মনে হয়, বাবা-মা ওর সামনে চুমু খেলে তার মোটেই অস্বাভাবিক লাগবে না।

রানু ফুলটুসকে বলে, বাবা এখন কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসবে। তুমি তোমার ঘরে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়ো, যাও।

ফুলটুস বিজুর গলা আরো শক্ত করে ধরে বলে, আমি বাবাকে চাই।

বিজু বলে, বেশ তো, চল। কিন্তু তার আগে আমাকে একটুখানি সময় দিতে হবে। তুই দাঁত ব্রাশ করে নে, আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।

ফুলটুসকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ায় বিজু। শোয়ার ঘরের দিকে যেতে যেতে রানুকে বলতে শুনলো, এইসব আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে তো মেয়ে মাথায় উঠছে!

একটা কানেই দিব্যি শোনা যায়, তবু মানুষের দুটো কান থাকে কেন? উত্তর, যাতে ভালো ভালো কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে! বিজু শিখে গেছে, সব কথা শুনতে নেই, জবাবও দিতে নেই। রানুর এই কথাটাও শুনতে পায়নি ধরে নেয় সে। দুটো কানই মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে হয় যে!

৪

বিজু নিজে জানে, বাচ্চা ছেলেরা কোনো একটা খেলনা চাই বলে যেরকম জেদ করে, সে নিজেও ঠিক তাই করছে। রানুর প্রেমে সে হাবুডুবু খাচ্ছিলো, তা নয়। মুখ ফুটে তোমাকে চাই বলে ফেলে সেটা গিলে ফেলতেও পারছিলো না। পিছিয়ে আসতে মনের জোর লাগে। তবু প্রত্যাখ্যানের যে শক্তি আছে জেদ বাড়িয়ে তোলার, সময়ে তা-ও ভোঁতা হয়ে আসে। শুধু শুধু জেদ করে, কান্নাকাটি দিয়ে খেলনা পাওয়া যাবে না বুঝে বাচ্চারাও একসময় চুপ করে যায়, মেনে নিতে শেখে। মুখে যতো বড়াই করুক, বিজুর জেদও থিতিয়ে আসছিলো।

রানুর ক্রমাগত প্রত্যাখ্যানকে আর অবজ্ঞা করা সম্ভব হয় না। সহ্য করার বদলে এক ধরনের আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠছিলো। রানু কী এমন, আমি কেন তাকে উপেক্ষা করতে পারবো না? রানুর খোঁজে তার ডিপার্টমেন্টে যাওয়া বন্ধ করে দিলে কেমন হয়? রানুর চোখ কি তখন তাকে খুঁজবে? 'না-থাকাই হবে আমার সবচেয়ে বড়ো থাকা!'

ডিসেম্বরের শেষে এক শীতসকালে বিজু ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে দেখে, ক্লাস হবে না, অঘোষিত ধর্মঘট। কী নিয়ে ধর্মঘট ঠিকমতো জানা যায় না। সবগুলো বিল্ডিং-এর সদর দরজায় তালা, ভেতরে যাওয়া যাবে না। সবাই ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ খোলা মাঠে গোল হয়ে বসে গল্প করছে। বিজুর মনে হলো, ক্লাস না হলে ভালোই তো। আগে থেকে জানা থাকলে এই সাতসকালে উঠতে হতো না, লেপমুড়ি দিয়ে আরো খানিকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যেতো।

আশেপাশে তাকিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাউকে চোখে পড়ে না। অনির্দিষ্টভাবে হাঁটতে শুরু করেছিলো সে। উত্তরে পলাশীর দিকের গেটে পৌঁছে মনে হয়, ইউনিভার্সিটির আর্টস বিল্ডিং-এর দিকে যাওয়া যায়। লাইব্রেরির আশেপাশে কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবেই। রিকশা নেওয়ার দরকার নেই, হেঁটে যাওয়া যায়। রাস্তা পেরোতে যাবে, এই সময় পেছন থেকে কেউ বলে, একটু শুনবেন?

মেয়েলি গলার স্বর, নাম ধরে ডাক নয়, যে কেউ যে কোনো কাউকে ডাকতেই পারে। ঘুরে না তাকিয়েও বিজু জানে, তাকেই ডাকা হচ্ছে। চিনতে ভুল হয়নি। রানু।

রাস্তা না পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, ফিরে তাকায় না। অপেক্ষা করে। রানু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে, আপনাকে ডাকছি অনেকক্ষণ, শুনতে পাচ্ছেন?

রাস্তায় এতো মানুষের কে কোথায় কাকে ডাকছে, কী করে বুঝবো! আমার নাম ধরে তো ডাকতে শুনিনি। সে যাকগে, কেন ডাকছিলে তাই শুনি।

শুনেছেন তো, আজ ক্লাস হবে না।

হ্যাঁ। ভাবছিলাম আড্ডা দিতে যাই। আড্ডাখানায় কখনো ধর্মঘট হয় না।

রানু বলে, তাহলে আর আপনাকে আটকাবো না।

কী আশ্চর্য, আমার কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমন্টে করা নেই, আড্ডায় সেটা লাগেও না। যখন খুশি যাবো, নাহলে যাবো না। তোমার কথা শুনি।

আপনার সঙ্গে কথা ছিলো।

বিজু গলায় কিছু শ্লেষ মেশায়, তাই তো বলি, দরকার না থাকলে আমাকে খুঁজে বের করবে কেন!

রানু খোঁচা হজম করে বলে, এখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবো?

বিজু মনে মনে ভাবে, ও ব্বাবা বেশ তো কথা ফুটেছে। কিন্তু হচ্ছেটা কী, তাই তো বোঝা যাচ্ছে না। বলে, কোথায় যেতে চাও?

তা জানি না।

তার মানে আমি যেখানে বলবো সেখানে যাবে?

রানু হাসে, হ্যাঁ।

রাস্তা পেরিয়ে সলিমুল্লাহ হলের সামনের ফুটপাথে উঠে এসে বিজু বলে, জাহান্নামে?

ওই জায়গাটায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

বিজু এবার হাসে, আমারও না। শুনেছি জাহান্নামের রাস্তায় এখন নাকি অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করছে ওয়াসা আর মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন। রাস্তা বন্ধ।

রানু হাসতে হাসতে বলে, এসব কথা পান কোথায় আপনি?

স্বরচিত।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির পেছনের লনে। বিজু দেখেছে, জায়গাটা এমনিতে খালি থাকে না, জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা বসে। এরকম জনশূন্য পাবে ভাবেনি। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে কি সময়টা বেশি সকাল?

সঠিক জানে না, তবে বিজু অনুমান করতে পারছে রানু কী বলতে চায়। আজই হয়তো সমর্পণের সময়। নিঃশর্ত? বিজুর নিজেরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আছে। এতোদিন একটা জেদের কারণে বারংবার প্রত্যাখ্যানের অপমান উপেক্ষা করতে পেরেছিলো। জিতে নেওয়ার নেশায় স্থির ছিলো বলে আর কিছুকে জরুরি মনে হয়নি। আবার গত কিছুদিনের হাল ছেড়ে

দেওয়ার মতো আলগা অবস্থায়ও সে পৌঁছে গিয়েছিলো, জয়ী হওয়া তখন আর ততো দরকারি নেই।

এখন কী করবে সে? প্রত্যাখ্যানের অপমান ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ তার আছে। নেবে? রানুকে সে অনায়াসে বলতে পারে, যে তোমাকে চেয়েছিলো সে আর এখানে বাস করে না।

অথবা পারে সে ক্ষমা করে দিতে। নিঃশর্তে।

সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানছিলো বিজু। রানু বলে, কী ভাবছেন?

আজ কার মুখ দেখে সকাল হয়েছিলো মনে করার চেষ্টা করছি।

কেন?

আমার সঙ্গে হঠাৎ তোমার কথা বলার দরকার পড়লো বলে। খুব অস্বাভাবিক না? এতোদিন উল্টোটাই হয়ে এসেছে।

সবদিন একরকম না-ও হতে পারে। সময়ে কতোকিছু পাল্টে যায়!

কিন্তু সবকিছুর আগে একটা জিনিস পাল্টানো দরকার।

কী?

বাংলা গল্প-উপন্যাসে আপনি থেকে তুমিতে নামতে বিশ-পঁচিশ পাতা খরচ হয়ে যায়। কী অপচয়, কোনো মানে হয়!

ইঙ্গিত না বোঝার কোনো কারণ ছিলো না। রানু বলে, অচেনা কাউকে চট করে তুমি করে বলা যায়?

অচেনা মানুষের সঙ্গে কেউ ব্রিটিশ কাউন্সিলের নির্জন লনে বসে না।

তোমার সঙ্গে তর্কে পারবো না।

এই সহজ জিনিসে এতো সময় লেগে গেলো!

বিজুর অনুমান মিলে যাচ্ছে। শর্তহীন সমর্পণ। রানুর কথা বলার ধরণই বলে দিচ্ছিলো, অনুমানের জন্যে আর অবশিষ্ট ছিলো না কিছু। কথা বলতে বলতে বিজু ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে লড়াই করে যায় – অপমানের প্রতিশোধ, না ক্ষমা?

কী হয় যদি সে এখন রানুকে ফিরিয়ে দেয়? বলে, রানু, তোমাকে আর চাই না আমার। একসময় ভেবেছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। এখন দেখছি তা আর মনে হচ্ছে না। কী হয় তাহলে, রানুর প্রতিক্রিয়া কী হবে? খুব আহত হবে সে? দুঃখিত হবে?

বিজুও হয়েছিলো একসময়, তখন কার কী এসে গেছে? কিন্তু এই নারীকে সে জয় করতে চেয়েছিলো, সে এখন নিজে থেকে এসেছে তার কাছে। ইচ্ছে করলে এখন স্পর্শ করা যায় তাকে। জিতে যাওয়ার লোভ কার না হয়? প্রতিশোধ? কীসের প্রতিশোধ?

সারাটা দিন একসঙ্গে কাটে। যাই যাই করেও রানুর বাসায় ফেরা হচ্ছিলো না, কথা যে শেষ হতে চায় না। শেষ বিকেলের দিকে একরকম জোর করে রিকশা ডেকে উঠে পড়ে রানু, আর দেরি হলে বাসায় অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। রিকশা চলতে শুরু করার আগেই বিজুও উঠে বসেছে রানুর পাশে।

রানু বলে, আরে এটা কী হচ্ছে?

একটু এগিয়ে দিই তোমাকে।

আমি একাই বেশ যেতে পারবো, রোজ যাচ্ছি। এগিয়ে দিতে হবে না।

বিজু রিকশাওয়ালাকে বলে, তুমি চলো তো ভাই।

রিকশা চলতে শুরু করলে রানু বলে, কেউ দেখে ফেললে?

দেখলে দেখবে, পাবলিক ন্যুইস্যান্স তো কিছু করছি না!

চেনা কেউ দেখে বাসায় বলে দিলে আমাকেই ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।

এতো ভাবলে চলে নাকি! মানুষের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, সারাক্ষণ চোখ রাখছে রানুর সঙ্গে কে যাচ্ছে তাই দেখতে!

একটু চুপ করে থেকে রানু বলে, আচ্ছা, তুমি এরকম ছেলেমানুষি করো কেন?

ছেলেরা ছেলেমানুষি করবে না তো কে করবে?

একটুও কি সিরিয়াস হতে জানো না তুমি?

না। বড়ো হলে হবো।

তার মানে এখনো বড়ো হওনি?

এখনো না। জানো, একটা গানে আছে – 'উওম্যান, আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড / দ্য লিটল চাইল্ড ইনসাইড অব আ ম্যান'। পুরুষমানুষের ভেতরে বাস করা ছোট্টো শিশুটিকে বোঝার চেষ্টা করো।

রানু যাবে টিকাটুলি, স্টেডিয়ামের কাছে এসে কোনোমতে ঠেলেঠুলে বিজুকে নামিয়ে দেয় সে। অনিচ্ছায় নেমে দাঁড়ায় বিজু। রানু মিষ্টি করে হেসে বলে, কাল দেখা হবে।

হতেই হবে।

এই সময়ে বিজু এখন কোথায় যায়, কী করে? বাসায় ফিরতে একদম ইচ্ছে করছে না। আজকের দিনটা অন্যরকম, উদযাপন করা দরকার একা একা। স্টেডিয়ামের গেটের সামনে ঝালনুন দেওয়া কাটা আমড়া কেনে। অনির্দিষ্টভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমড়া খায় সে, টকঝাল মিলিয়ে অদ্ভুত মজাদার জিনিস। হঠাৎ মনে পড়ে, ক্লাসে যাওয়ার জন্যে যে নোটবই হাতে ছিলো, সেটা এখন নেই। রানুর ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিলো, ওর সঙ্গে চলে গেছে। আপনমনে হাসে বিজু। নোটবইয়ের দোষ কি? তার মালিকও যায় যায়। সে নিজে না পারুক, নোটবইটি তার প্রতিনিধি হয়ে রানুর সঙ্গে থাক।

বিকেলের রোদ মরে গেছে, সন্ধ্যা নামছে। সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলো সে। 'আর কি কখনো কবে, এমন সন্ধ্যা হবে...'

৫

রানুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, কোথায় যাচ্ছে – এসব আর আজকাল তেমন ভাবতে ইচ্ছে করে না বিজুর। কী হবে? কোনোকিছু পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। যা হবে তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে হবে। শুরুতে এই যুদ্ধ-সন্ধি খেলাটা দুরূহ ও দুঃসহ মনে হতো, কিন্তু কালক্রমে সব সয়ে যায়।

বারো বছরের অনবরত লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় অতি নিপুণ ও অনিচ্ছুক এক সমরবিদ সে। এই যুদ্ধ, তো এই সহাবস্থানের সন্ধি। সহাবস্থান মানে কি? পরস্পরকে সহ্য করে অবস্থান করা? যতোক্ষণ না আবার টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়, টেনশন বাড়ে, যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে? প্রথম গোলাটি নিক্ষিপ্ত হয়? তাই হবে। তবে তাই হোক।

একটা প্রজেক্টের কিছু খুচরো কাজ নিয়ে বস্টনে যেতে হবে, রানুকে জানিয়েছিলো অফিস থেকে ফিরে। শুনে রানু প্রস্তাব দেয়, আমি আর ফুলটুসও তোমার সঙ্গে ঘুরে আসতে পারি।

খুব ভালো কথা। আমি কিন্তু সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকবো, সন্ধ্যার আগে সময় হবে না। অচেনা জায়গায় তোমরা একা একা কোথায় ঘুরে বেড়াবে? সারাদিন হোটেলে বসে থাকারও কোনো মানে হয় না।

মিষ্টির বাসায় যেতে পারি আমরা। ওর সঙ্গে বেড়ানো যাবে। আর কিছু না হলে সারাদিন আড্ডা দেওয়া হবে। ওর ছেলে ফুলটুসের বয়সী, ওদেরও ভালো সময় কাটবে।

বিজুর মনে পড়ে, রানুর এই বান্ধবীটি বস্টনেই থাকে। মাঝেমধ্যে ফোনে কথা হয়। ওদের বিয়ের পর বার দুয়েক ইস্কাটনের বাসায় এসেছে মিষ্টি। বিজু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলো, আমার কোনোদিন ডায়াবেটিস হলে তুমি কিন্তু ভুলেও আমার কাছাকাছি আসবে না। মিষ্টি প্রথমে ধরতে পারেনি, বিজু ব্যাখ্যা দিয়েছিলো, তখন কিন্তু ডাক্তারের কড়া নিষেধ থাকবে, তবু মিষ্টি দেখলে খেতে ইচ্ছে করবেই! নিষিদ্ধ হলে লোভ বেশি হয় না!

রানুর আইডিয়া পছন্দ হয় বিজুর। সায় দিয়ে বলে, বেশ তো, তোমার অফিসে কাল কথা বলো, ছুটি পাবে কি না আমাকে জানাও। ট্রাভেল এজেন্টকে বলে একই ফ্লাইটে টিকেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

রানুর ছুটির সমস্যা ছিলো না, কিন্তু গোলমাল হলো মিষ্টিকে নিয়ে। ননদের বিয়েতে সে ঢাকায় যাচ্ছে পরের সপ্তাহে। ব্যস, রানু দপ করে নিভে গেলো। এ-ও বিজুর কাছে এক ধাঁধা, যে কোনো কিছু নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রানু খলবলিয়ে উঠতে পারে, আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে তেমন কোনো কারণ ছাড়া শোকসভায় যাওয়ার চেহারা বানিয়ে ফেলতেও

দক্ষ সে। বস্টন যাওয়ার উপলক্ষ আর মিষ্টির দেশে যাওয়ার সময় কাছাকাছি পড়ে গেছে, সেখানে কারো কিছু করার নেই! তাহলে?

তবু বিজু বলে, ছুটি যখন নিয়েই ফেলেছো, টিকেটটা করে ফেলি। আর এর মধ্যে খোঁজখবর করে দেখা যাক, বস্টনে চেনা কাউকে না কাউকে হয়তো পেয়ে যাবো। আমার কাজ শেষ হলে না হয় আরো দু'দিন থেকে তারপর ফিরবো।

রানুর তাতে মত নেই, সে যাবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে। তার মন খারাপ থাকলো প্রায় সারাদিন। রাতে বিজু প্রস্তাব দেয়, যদি বস্টনে যাবে না ঠিক করে থাকো, তাহলে এক কাজ করো। ছুটি নিয়ে ফেলেছো, ফুলটুসকে নিয়ে হিউস্টন ঘুরে এসো।

হিউস্টনে রানুর বড়ো বোন থাকে, গাড়ি নিয়ে চার-পাঁচ ঘণ্টায় দিব্যি চলে যাওয়া যায়। বিজু ভাবছিলো, ঘরে বসে ছুটি নষ্ট না করে হিউস্টন একটা বিকল্প হতে পারে। ওদেরও ভালো লাগবে, ফুলটুস বড়ো খালামনির খুব ভক্ত।

রানু হঠাৎ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, ফুলটুসের স্কুল আছে না?

হাসবে না কাঁদবে, বুঝে উঠতে খানিক সময় লেগে যায় বিজুর। আশ্চর্য, বস্টনে যাওয়ার কথা হচ্ছিলো, তখন ফুলটুসের স্কুলের কথা ওঠেনি! এখন হঠাৎ! 'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভন্ অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও...।'

বস্টন যাওয়ার দু'দিন আগে সন্ধ্যায় অফিসে আটকে যায় বিজু। কয়েকদিন আগে একটা প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করেছিলো। একটু আগে বস্ এসে জানিয়ে গেলো, বেশ কিছু অদলবদল করতে হবে এবং শেষ করে দিতে হবে আজই। তখন বিকেল চারটা। বিজুর খুশি হওয়ার কারণ নেই, বস্ যেভাবে বলে দিয়েছিলো, আগে সেভাবেই সে করেছিলো। এখন শেষ মুহূর্তে এসে বলছে, বদলে দাও। অন্তত ঘণ্টা চারেক লেগে যাবে শেষ করতে। কিছু করার নেই, এর নাম চাকরি।

বাসায় ফোন করে রানুকে বলেছিলো, আমার আজ ফিরতে দেরি হবে। কতো দেরি, তাও বলতে পারছি না।

রানুর ঠাণ্ডা গলার উত্তর, এ আর নতুন কী!

রানু, প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো। ক'দিন আগের করা একটা প্রজেক্ট প্ল্যান বদলাতে হবে আজকের মধ্যে। আমাকে ধরিয়ে দিয়ে গেলো এই একটু আগে।

বেশ তো, কাজই করো। তোমাকে বাসায় আসতে হবে না।

মানে?

মানে আবার কী? তোমাকে দিয়ে তো ঘরের কোনো কাজই হবে না। সারাদিন অফিস করে ডে-কেয়ার থেকে ফুলটুসকে তুলে নিয়ে এসেছি। এখন রান্না করতে হবে, মেয়েকে গোসল করাতে হবে, খাওয়াতে হবে। এদিকে মেয়ে বাবার সঙ্গে গোসল করবে বলে জেদ ধরে বসে আছে।

বিজু আস্তে আস্তে বলে, আমি এখন তাহলে কী করতে পারি?

কিছু করতে তোমাকে, কেউ বলেনি। যেখানে আছো থাকো, যা করছো তাই করে যাও।

বিজুকে আর কিছু বলার সুযোগ দেয় না রানু, ফোন রেখে দিয়েছে। বিজু থম ধরে বেকুবের মতো বসে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বাইরে যায়। এইসব সময়ে সিগারেটের চেয়ে ভালো আর কী আছে!

রাতে বিজুর ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় একটা বেজে গিয়েছিলো। রানু-ফুলটুস নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে গেছে, প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে নিজের বাসায় চোরের মতো ঢুকে দেখে বসার ঘর অন্ধকার। ঠিক অন্ধকার নয়, ঘরের আলো নেভানো, টিভি চলছে, সেই আলোতে ঘর আলো। রানু ঘুমিয়ে গেছে সোফার ওপরে। পেটভর্তি খিদে নিয়ে ফিরেছিলো বিজু, কিন্তু এখন খাবার টেবিলে বসলে সাড়া পেয়ে রানু উঠে পড়তে পারে। দু'গ্লাস পানি খেয়ে শুতে চলে গিয়েছিলো সে।

সকালে ফুলটুসকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে এসে দেখে, রানু এক বাটি সিরিয়াল নিয়ে বসেছে খাবার টেবিলে। অন্যান্য দিনে বিজু একবারে তৈরি হয়ে মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অফিসে চলে যায়। গতকাল অনেকরাত পর্যন্ত কাজ করেছে, আজ দেরি করে যাবে। রানুর অফিস খুব দূরে নয় বলে সে আটটার মিনিট দশেক আগে বেরিয়েও ঠিক সময়মতো অফিসে পৌঁছতে পারে।

বিজু কফি মেকার চালু করে দিয়ে বাটিতে দুধ-সিরিয়াল ঢালে। টেবিলে এসে বসে। দু'জনে মুখ নিচু করে খুব মনোযোগের সঙ্গে খায়, যেন সিরিয়ালের বাটি ছাড়া দর্শনীয় আর কিছু নেই।

'নো স্মাইলস, নট আ সিঙ্গল ওয়ার্ড অ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল্ / ...সো মাচ দ্যাট আই ওয়ানা সে, বাট আই ফীল আনএবল্ / ...ওয়ান ম্যান ওয়ান উয়োম্যান, ওয়ান লাইফ টু লিভ টুগেদার...'

৬

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলে বিজু সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলে, এবার বিয়েটা সেরে ফেলা দরকার।

রানু হেসে ফেলে, তোমার যে বিয়ের এতো শখ!

আরে কী আশ্চর্য, শখ হবে কেন? এটা হলো দরকারের কথা। শখের কাজ মানুষ ইচ্ছেমতো যখন-তখন করে। আমার এখনো একবারই বিয়ে করা হলো না।

সবাই যে বলে, বিয়ে দিল্লিকা লাড্ডু। খেলে মানুষ পস্তায়, না খেলেও নাকি পস্তায়।

ফল যদি একই হয় তাহলে খাওয়াটাই লাভ। চলো খেয়ে দেখা যাক।

দু'বাড়িতেই কমবেশি জানাজানি হয়ে গেছে ততোদিনে। রানুকে একদিন বাসায় নিয়ে গিয়ে মা-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো বিজু। পরে জিজ্ঞেস করেছিলো, কেমন দেখলে মা? তোমার ছেলের বউ হলে কেমন হয়?

মা-র সঙ্গে বিজুর হাসি-ঠাট্টাও চলে। মা বলেছিলো, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা হয়ে যাবে না তো?

আজকালকার বাঁদররা মুক্তার কদর জানে মা।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক কথা পাড়ার একটা ব্যাপার থাকে, সেটা সামলাবে কে? বিজুকে নিয়ে রানু যায় ধানমণ্ডিতে বোনের বাসায়। দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বোন-দুলাভাইকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলা হলো। দুলাভাই খুব গম্ভীর মুখে জানায়, আমার কিন্তু একদম মত নেই।

থতমত খেয়ে যায় রানু। দুলাভাইয়ের ওপর অনেক ভরসা বলে আসা। রানু বলে, মানে?

একটিমাত্র শ্যালিকার দখল কোন দুলাভাই ছাড়তে চায়? যে চায় সে মহা আহাম্মক। এতোদিন ধরে আশা করে আছি, শ্যালিকাসুন্দরীর মন একদিন গলবে। এখন সে আশাও গেলো বলে।

একচোট হাসাহাসির পর রানু বলে, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম তো জন্ম-জন্মান্তরের। তাই বলে বোনের অফিসিয়াল সতীন তো আর হতে পারি না।

সেখানেই তো কথা। আমার যদি সত্যি সত্যি আরেকটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে তাহলে কী হবে বল তো? কোথাকার কে এসে তোর বোনের সতীন হয়ে বসবে। তার চেয়ে তুই রাজি হয়ে গেলে সবদিক থেকে ভালো। দুই বোনে মিলেমিশে থাকতিস। ঝগড়াঝাটি চুলোচুলি হলেও ঘরের কথা ঘরেই থাকতো। কতো সুবিধা বল তো!

আপা বলে উঠেছিলো, আহা, শখ কতো!

রানু বলে, তোমার সঙ্গে প্রেম বিয়ের পরেও চলতে পারে, দুলাভাই।

তখন কি আর তুই আমকে পাত্তা দিবি?

তুমি এমন আনাড়ি জানতাম না। তখন হবে পরকীয়া প্রেম। জানো না, পরকীয়া প্রেম সবচেয়ে মিষ্টি!

রানুর দুলাভাই উদ্যোগী মানুষ বোঝা গেলো। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে দেখাদেখি, কথাবার্তা সব শেষ। কোনো পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠেনি, কারণও কিছু ছিলো না।

বিয়ের রাতে রানুর প্রথম বাক্য, আমাকে তুমি বিয়ে করলে কেন?

আমাকে কতোবার ফিরিয়ে দিয়েছিলে মনে আছে, এখন যাবে কোথায় জাতীয় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো বিজু, তার আগেই বোমা ফাটিয়েছে রানু। ওই একবারই অবশ্য, কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

বিয়েতে ছেলেকে নিয়ে ভাই-ভাবী এসেছিলো। বউভাতের পরদিন বড়ো ভাই বিজুর হাতে দু'খানা প্লেনের টিকেট ধরিয়ে দিয়ে বলে, যা, দু'জনে মিলে ঘুরে আয়।

সিঙ্গাপুরের টিকেট। ভাইয়ের পরামর্শমতো সিঙ্গাপুরে দু'দিন থেকে মালয়েশিয়ার দেসারু বলে একটা সমুদ্রসৈকতে চলে গিয়েছিলো। সিঙ্গাপুর থেকে গাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক।

কী যে সুন্দর জায়গা দেসারু। বিজু-রানুর মুগ্ধতার শেষ ছিলো না। জায়গাটা এখনো ট্যুরিস্ট স্পটের মতো করে তৈরি হয়ে ওঠেনি। ভ্রমণকারীদের জন্যে থাকা-টাকার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বড়ো হোটেল-শপিং সেন্টার এসব নিয়ে হৈ হৈ করা বাণিজ্যিক রিসর্ট হয়ে ওঠেনি। অনেকখানি প্রাকৃতিক, যেন ইচ্ছে করেই এভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের পানি এতো স্বচ্ছ যে কোমরসমান পানিতে দাঁড়িয়ে পায়ের পাতা স্পষ্ট দেখা যায়।

বিজু মনে মনে বলে, এই জায়গাটা যেন চিরদিন এরকম থাকে। দেসারুর কথা বেশি লোকের জানার দরকার নেই। জানলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এটা তার নিজস্ব ভ্রমণবিলাস হয়ে থাক, এখানে বারবার ফিরে আসবে সে।

খুব নামকরা নয়, এরকম অপ্রচলিত জায়গাই বেড়ানোর জন্যে বিজুর বরাবর পছন্দ। দেসারুতে দুই কামরার একটা কটেজে উঠেছিলো। বাসনকোসনসহ কিচেন আছে, রান্নাবান্না ইচ্ছে করলে করা যায়। মধুচন্দ্রিমায় কেউ রান্নায় সময় নষ্ট করে? খাওয়ার জন্যে আধমাইল হেঁটে যেতে হয় রেস্টুরেন্টে। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে ঘন গাছগাছালির ছায়াঢাকা রাস্তায় হাঁটতেও ভালো লাগে। বিকেলে সমুদ্রস্নান, সন্ধ্যায় সমুদ্রের পাড়ে খালিপায়ে হাঁটাহাঁটি। এখানে নিজেদের নাম-পরিচয় মনে না রাখলেও চলে।

ইস্কাটনের বাড়িতে নতুন সংসার শুরু হয়েছিলো। বিয়ের পরপরই বাবা-মাকে একদম একা ফেলে আলাদা বাসায় যেতে চায়নি বিজু, বড়ো ভাই আগেই দেশান্তরী। ধীরেসুস্থে একটু গুছিয়ে নিজেদের আস্তানায় যাওয়ার ইচ্ছে। রানুর আপত্তি ছিলো না।

কর্মজীবন শুরু না করলে নাকি পুরুষমানুষ হয়ে ওঠা সম্পূর্ণ হয় না। চাকরিটা বিজু বেশ উপভোগ করতে শুরু করেছিলো। অফিসে এক ধরনের পরিবেশ, যার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিলো না। আগে কখনো কখনো কোনো অফিসে গেছে কোনো কাজে, কিন্তু নিজে সে অফিসের কেউ ছিলো না, ছিলো শুধু অতিথি বা কারো সাক্ষাতপ্রার্থী। এখন তার নিজের অফিস, নিজস্ব বসার জায়গা, চেয়ার-টেবিল। নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব, সে কাজ সময়মতো সম্পন্ন করার শর্ত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার পরিতৃপ্তি একটি সফল যৌনসঙ্গমের চেয়ে কম নয়।

দিনের শেষে নির্ভার হয়ে ঘরে ফেরা, অপেক্ষমান একটি সুন্দর মুখের মুখোমুখি হওয়া। শুধু সাতসকালে উঠে তৈরি হওয়াটাই যা কষ্টের। মনে হতো, সদ্যবিবাহিতদের দেরি করে অফিসে যাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। তার হাতে কোনোদিন ক্ষমতা এলে এই নিয়ম সে চালু করে দেবে। যারা অফিসের সময় নির্ধারণ করে, তারা সবাই নিশ্চয়ই চিরকুমার নয়, তারা নিজেরাও সদ্যবিবাহিত ছিলো কোনোদিন। তবু বোঝে না কেন? ভুলে গেছে? নাকি খুবই অসুখী দাম্পত্য ছিলো তাদের? বউয়ের কাছ থেকে দূরে থাকাতেই আনন্দ?

বিজুর অবশ্য বউয়ের কাছাকাছি থাকতে ভালো লাগছিলো। আমাকে তুমি বিয়ে করলে কেন প্রশ্নটা কাঁটার মতো তবু ফুটছিলো থেকে থেকে। জিজ্ঞেস করবে করবে ভেবেও করা হয়নি। মুখে আটকায়। ওই প্রশ্নের সঙ্গে মেলানো যায়, এমন কোনোকিছু পাওয়া গেলো না।

একসময় বিজুর নিজের সন্দেহ হতে থাকে, রানু কি সত্যি বলেছিলো? যদি না-ই বলে থাকে, এই কথা সে পেলো কোথায়? কোনো ঘটনা আদৌ কখনো ঘটেনি, তবু তাকে সত্যি বলে ভ্রম হলেও হতে পারে। সেরকম কিছু?

৭

শোয়ার ঘরে আলো জ্বেলে বিজু দেখে, পরিপাটি বিছানা। বেডকভার আর কম্ফর্টার আজই পাল্টানো হয়েছে বলে মনে হয়। নাকি এরকমই সে দেখে গিয়েছিলো বস্টন যাওয়ার আগে? মনে করতে পারে না। নিজের বেলায় যতো অমনোযোগী হোক, বাড়িঘর ছিমছাম পরিপাটি রাখতে ক্লান্তি নেই রানুর। বিশেষ করে বাসায় কারো আসার কথা থাকলে সে বুলডোজারের নির্দয়তায় বিজুর কাগজপত্র, ফুলটুসের খেলনা-বই-ক্রেয়ন সব সরিয়ে ফেলতে থাকে। বাসায় একটা বাচ্চা আছে, এখানে-ওখানে তার দু'একটা খেলনা পড়ে থাকতেই পারে, অতিথিরাও নিশ্চয়ই বুঝবে – এই যুক্তি রানুর কাছে একেবারে অচল। অতিথি এসে যেন সবকিছু ছবির মতো সাজানো দেখে।

কোথায় এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক নজরে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি খুঁটিনাটি দেখে ফেলতে সক্ষম। যে ঘরটি একজন পুরুষের কাছে দিব্যি পরিপাটি সাজানো মনে হচ্ছে, একজন মেয়ে তার মধ্যে দশটা খুঁত খুঁজে পাবে অনায়াসে। আর কোনো গবেষণা বিজুর এমন সর্বাত্মক সমর্থন পায়নি। তবু আজ একটু অতিরিক্ত যত্ন আছে বলে তার ধারণা হয়। এমনও হতে পারে, বিজু হয়তো সেরকম ভাবতে ইচ্ছুক। রানুর শাড়ি পরা, সামান্য সাজও কোনো ধারণা দিয়ে থাকবে।

ঘরের পোশাক পরে বিজু গোসল করার কথা ভাবে। তার আগে ফুলটুসকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। দেরিতে ঘুমালে মেয়ে সকালে উঠতে বড্ড ঝামেলা করে। হাতমুখ অবশ্য না ধুয়ে নিলে নয়। শরীরে ধুলোময়লা নিয়ে মেয়ের ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না।

মনে আছে, ফুলটুস হওয়ার পর প্রথম প্রথম সিগারেট খেয়ে ওর কাছাকাছি যেতে বিজুর অস্বস্তি হতো খুব। নিজেকে ভারি অপরিচ্ছন্ন লাগতো, মনে হতো সিগারেটের গন্ধে ফুলটুসের তুলতুলে কচি শরীরের টাটকা গন্ধ ঢাকা পড়ে যাবে। দাঁত মেজে মুখহাত ভালো করে ধুয়ে নিতো আগে।

নতুন বারবিকে নিয়ে বিছানায় যায় ফুলটুস। ঘুমিয়েও পড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে। ঘরে নাইট লাইট জ্বালিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারে গান চালু হলে একেবারে কথা বন্ধ। অভ্যাস করাতে অনেক সময় লেগেছে। আগে বিছানায় শুয়ে মেয়ের রাজ্যের কথা মনে পড়ে যেতো, এক প্রশ্নের লেজ ধরে আরেকটা, তারপর আরেকটা, আরো একটা – চলতেই থাকতো।

ফুলটুসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিজু। রানু সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে টিভি দেখছে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকায়। বলে, খাবার কি এখন দিয়ে দেবো?

নিজে থেকে খাবার দেবে কিনা জিজ্ঞেস করছে! হলো কী রানুর? বিজু বললো, নাঃ, আগে গোসল করতে হবে। তুমি খেয়ে নিয়েছো?

এতো দেরি করে আমি কবে খাই?

তা-ও ঠিক। ফুলটুস হওয়ার পর সামান্য ওজন বেড়ে গিয়েছিলো রানুর, বহু কষ্টে হেলথ ক্লাবে মাস তিনেক নিয়মিত হাজিরা দিয়ে বাড়তি পাউন্ডগুলো ঝরাতে পেরেছে। এখনো মাঝেমধ্যে যায়, সপ্তাহে দু'তিনবার। এখন অফিস থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয় সে, সন্ধ্যার পর আর কিছু খায় না।

বিজু ভেবে প্রশ্ন করেনি। কথার কথাও তো মানুষ বলে, নাকি বলে না! সে কি আশা করেছিলো, রানু তার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবে? অন্তত আজকের জন্যে? উচিত হয়নি। কী এমন রাজ্যজয় করে এলো সে যে, আজ নিয়ম-টিয়ম সব উল্টে যাবে? তবু কেন যেন মনে হচ্ছিলো। 'তার পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর...।' মাতাল হাওয়ার ঝলকের মতো সুগন্ধি-সুবাস!

সোফার পাশে রাখা হাতব্যাগ খুলে কাগজে মোড়া জিনিসটা বের করে বিজু। রানুর পাশে বসতে বসতে হাত বাড়িয়ে তুলে দেয়। রানু উঠে বসে। বলে, কী এটা?

শহরের বাইরে কোথাও গেলে বিজু খালি হাতে ফেরে না, রানুর জন্যে কিছু একটা আনে। স্যুভেনির ধরনের কিছু। বিজু বলে, খুলে দেখো।

রানু কাগজের মোড়ক খুলতে বেরিয়ে আসে একটা কফি কাপ আকৃতির পেন হোল্ডার। সামনের দিকটা বড়োসড়ো কাপের মতো দেখতে, পেছনে একেবারে চ্যাপ্টা। মনে হবে ভার্টিক্যাল একটা কোপ মেরে কাপটাকে আধখানা করে ফেলা হয়েছে। ওপর থেকে দেখলে কাপের মুখ ইংরেজি ডি অক্ষরের মতো। গায়ে লেখা: বস্টন ওয়াজ সো এক্সপেনসিভ দ্যাট আই ক্যুড অ্যাফোর্ড অনলি হাফ আ কাপ।

খুব অপ্রত্যাশিতভাবে একটা স্নিগ্ধ হাসি ফোটায় রানু। বলে, খুব মজার তো!

এক মুহূর্তের জন্যে বুয়েটের সময়টা ফিরে এলো বলে মনে হয় বিজুর।

বলে, মনে হলো তোমার পছন্দ হবে।

খুব সুন্দর। মেয়ের জন্যে বারবি পুতুল, আমার জন্যে আধখানা কাপ, তোমার জন্যে কী?

বিজু কবিতা পড়তে ভালোবাসে, বলা উচিত একসময় ভালোবাসতো, ছন্দটন্দ তেমন বোঝে না। তবু রানুর শেষের কথাটা কবিতার লাইনের মতো শোনায় – মেয়ের জন্যে বারবি পুতুল, আমার জন্যে আধখানা কাপ, তোমার জন্যে কী? বাঃ, বেশ তো!

আমার জন্যে আবার কী?

রানু উঠে গিয়ে পেন হোল্ডার রাখে কিচেন কাউন্টারের ওপরে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা কলম তুলে নিয়ে রাখে তার ভেতরে। ফিরে এসে বিজুর পাশে বসে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। ইচ্ছেটাকে আবার শাসন করে বিজু, সতর্ক হওয়া উচিত।

টিভিতে কী একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিলো, বিজু লক্ষ্য করেনি। রানু রিমোট টিপে চ্যানেল বদলে দেয়। সিএনএন। রানু খবর-টবর বিশেষ দেখে না, টিভিতে তার পছন্দের জিনিস হলো মুভি। খুঁজে খুঁজে সে নতুন-পুরনো, রঙিন-সাদাকালো সব ছবিই দেখে। এখন চ্যানেল পাল্টায় সম্ভবত বিজুর জন্যে।

বিজু টিভির সামনে বিশেষ বসে না, সকালের কফি খেতে খেতে খবরের শিরোনামগুলো দেখে নেয়। এখন তর্ক চলছে ইরাকে সাদ্দামের ছেলেদের খুন করার পর তাদের ছবি টিভিতে দেখানো উচিত হয়েছে কি না তাই নিয়ে। খুন করাটা জায়েজ ছিলো কিনা তা কেউ বলছে না। পৃথিবীতে কতো যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন আছে! কেউ কেয়ার করে?

রানু টিভির পর্দায় চোখ রেখে বলে, তোমার জন্যে নয় কেন?

নিজের জন্যে কেনা যায়? বিজুর চোখও টিভিতে।

কিনলেই কেনা যায়।

বিজু বলে, তুমি জানো নিজের জন্যে কী কেনা যায় তা খুঁজেই পাই না।

কথাটা ঠিক। টুকটাকি জিনিস ছাড়া নিজের জন্যে কিছু সে কিনতে পারে না, জানেও না। কোনো একটা শার্ট কাউকে পরতে দেখে হয়তো খুব পছন্দ হয়ে গেলো, নিজে দোকানে গিয়ে ওই ধরনের কিছু খুঁজে পায় না। যা সামনে দেখে, কোনোটাই পছন্দের মনে হয় না। জামাকাপড় থেকে শুরু করে বিজুর প্রায় সব কেনাকাটা রানুর।

রানু আচমকা জানায়, সিগারেট তো নিজেই কেনো!

এবার রানু তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে টের পায় বিজু।

প্যালেস্টাইনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের শান্তি আলোচনার সময়ও দুই পক্ষের মধ্যে খুনোখুনির খবর এখন টিভিতে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকেরা কীসব বলছে বিজুর মাথায় ঢোকে না। শুনলে না ঢুকবে! তার এখন উপস্থিত সংকট, সে বুঝতে পারছে না রানু ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে। শান্তির পায়রার দিকে তাক করা বন্দুক।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছে বিজু, পিঁপড়েরা যেমন বৃষ্টির গন্ধ পায়। উঠে দাঁড়ায় বিজু। তাড়াতাড়ি বলে, বরং খেয়ে নিই এখন।

এই না বললে গোসল করে খাবে।

তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে, আগে খেয়ে নিই। গোসল পরে।

খিদে পাওয়ার কথাটা মিথ্যা নয়, অজুহাতও নয়। বস্টন থেকে ক্ষুধার্ত সে। তবু এখন এই সময়ে তা কাজে লাগাতে পেরে নিজের ওপরে খুশি হয়ে ওঠে বিজু।

রানু বলে, পাঁচটা মিনিট সময় দাও, খাবারগুলো গরম করে দিই।

তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি করে নিতে পারবো।

কেন, আমি করলে খাওয়া যাবে না?

আমি কিন্তু তা বলিনি, শুধু বলেছি নিজেই করে নিতে পারতাম।

মাছ তখনই বড়শিতে ধরা পড়ে, যখন সে মুখ খোলে। মহাজনদের বাক্যি। চুপ করে থাকার অভ্যাস করা দরকার, বিশেষ করে যখন কথা না বললেও চলে। বিজু কিছু ভেবে বলেনি, খাবার গরম না করলেও ক্ষতি কিছু নেই। একেবারে সদ্য ফ্রিজ থেকে বের করা না হলে ঠাণ্ডা খাবার সে দিব্যি খেয়ে ফেলতে পারে। গরম করার দরকার হলে নিজে করে নেওয়া যায়, মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। তা যে তাকে আদৌ কখনো করতে হয় না, তা-ও নয়। রানু একটু সুন্দর করে বলতে পারতো। চাই কি একটা কপট ধমক দেওয়ারও সুযোগ ছিলো। তা-ই কি উপযুক্ত হতো না!

রানু খাবার গরম করে টেবিলে সাজিয়ে দেয়। ভাজা ইলিশ আর কষানো গরুর মাংসের সঙ্গে খিচুড়ি। খেতে ভালোবাসে বিজু, খিচুড়ি-গোমাংস তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। এই দুই পদ না থাকলে বেহেশত-দোজখ কোনোখানেই তার আগ্রহ নেই।

আলুভর্তা, ছোটো মাছের চচ্চড়ি নিয়ে বাঙালি বড়ো বেশি আদিখ্যেতা করে, সেসবে খুব আসক্তি নেই তার। ভাজাভুজি হলে সবজিও চলে, কিন্তু সালাদকে সে গরু-ছাগলের খাদ্য মনে করে। নিজেকে সে মাংসাশী প্রাণী বলে পরিচয় দেয়। শরীর ঠিক রাখার অজুহাতে খাবার নিয়ে কতো রকমের এক্সপেরিমেন্ট আজকাল, রানু নিজেও সে আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক। মেদহীন ছিপছিপে শরীরের মালিক বিজুর এসব না ভাবলেও চলে। কখনো যদি সেরকম সময় আসে, তখন দেখা যাবে।

আজ হঠাৎ হলো কী রানুর? না বলতেই বাসায় শাড়ি পরার মতো একটা দুর্লভ ঘটনা ঘটিয়েছে। যত্ন করে একটু সাজগোজও করেছে দেখা যাচ্ছে। টেবিলে বিজুর পছন্দের খিচুড়ি-গোমাংস। এমন নয় যে, এসব তার ভালো লাগছে না। খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু নিজে থেকে সে আর এসব আশা করে না আজকাল। না করা অভ্যাস হয়ে গেছে।

আরো বড়ো সমস্যা, এই যে ভালো লাগছে তা বলা যাবে কেমন করে? সে কি বলবে, রানু তোমাকে সুন্দর লাগছে! বড্ড ফাঁপা। আর কীভাবে বলা যায়? ভয়ও আছে, বললে আবার উল্টো মানে হয়ে গেলে? রানুর আগের কথাগুলো খাঁজকাটা ছুরির খোঁচার মতো বিঁধছে এখনো!

খাওয়ার টেবিলে উল্টোদিকের চেয়ারে রানু বসা, কিছু বলছে না। মুখ নিচু করে খেয়ে যায় বিজু। চোখ তুলে তাকাতে বার দুয়েক চোখাচোখি হয়ে যায়, রানু ওর খাওয়া দেখছে। সে খেতে বসেছে, রানু কাছে বসে আছে, এই ঘটনা শেষ কবে ঘটেছিলো? একসঙ্গে খাওয়া আজকাল হয় না। দু'জনে সারাদিন অফিসে, দুপুরে একসঙ্গে খাওয়ার প্রশ্ন নেই। বিজু ফিরতে ফিরতে রানুর রাতের খাওয়া হয়ে যায়।

ফুলটুসের খাওয়া টিভির সামনে বসে, কার্টুনের চাটনি না হলে খাবার মুখে রোচে না তার। বিজুর জন্যে টেবিলে খাবার দেওয়া থাকে। ইচ্ছে হলে গরম করে নেয়, নাহলে ওভাবেই খেয়ে নেয়। অবশিষ্ট খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে রাখার দায়িত্ব তার।

এক রাতে মাংসের বাটিটা তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলো। পরদিন শনিবার, ছুটির দিন। ঘুম থেকে উঠে দেখে রানু স্প্রে দিয়ে ঘষে ঘষে কার্পেটে একটা দাগ তোলার চেষ্টা করছে। ফুলটুস কিছু ফেলেছে। বিজুকে দেখতে পেয়ে রানু গলায় কিছু বাড়তি ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে, কাল রাতে মাংসের তরকারিটা তুলে রাখতে কী হয়েছিলো? সবটা গন্ধ হয়ে গেছে। ওই মাংসই খেয়ো, আমি আর রান্না করতে পারবো না। ঘরের একটা কিছু তোমাকে দিয়ে হয় না। সব কাজ আমাকে একা হাতে করতে হবে? বাঁদী পেয়েছো?

অভিযোগ। অভিযোগের বিবরণ। সিদ্ধান্ত। আনুষঙ্গিক আরো অভিযোগ। প্রশ্ন। এবং আরো প্রশ্ন। পর পর কি এগুলো সব সাজানো ছিলো? হাঃ, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আ নিউ ডে।

এরকম ভুল তার হয় না, কাল ভুলে গেলো কী করে? মনে পড়ে, আগের রাতে সে বাসায় খায়ইনি, বাইরে খেয়ে এসেছিলো। অফিসে দেরি হচ্ছিলো বলে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খেয়ে নিয়েছিলো। ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশটা, রানু-ফুলটুস তখন ঘুমিয়ে গেছে। টেবিলের খাবার তোলা আর হয়নি।

ব্যাখ্যা দেওয়া যেতো, কিন্তু চেঁচামেচি দিয়ে দিন শুরু করা তার পছন্দ নয়। পরে দেখেছে, কোথায় কী? তরকারিটা মোটেই নষ্ট হয়নি। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখলো, গরম করে খেয়ে খারাপ কিছু বুঝলো না। পেটের গণ্ডগোল হয়নি। রানুকেও খেতে দেখেছিলো। তাহলে? বিজুর কাছে উত্তর নেই।

কোনো কোনোদিন ফ্রিজে রাখা খাবার নিজেই গরম করে টেবিলে বসে যায় সে একা। 'আই অ্যাম অলরেডি গন... সাম ডে ইউ আর গনা ইট ইয়োর লাঞ্চ বাই ইয়োরসেলফ্...।'

একা বসে খাওয়ার মধ্যে এক ধরনের ভিখিরি-ভিখিরি ব্যাপার আছে। ছোটোবেলায় দেখেছে, কোনো ভিখারি খাবার চাইলে মা কাঁসার থালায় করে ভাত-তরকারি সাজিয়ে দিতো, কাঁসার গ্লাসে পানি। কাঁসার বাসনগুলো ভিখারিদের জন্যে নির্দিষ্ট করা। বিজু কতোদিন দেখেছে, দরজার সামনে বসা ভিখারি একা একা খেয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে বাঁ হাতে গ্লাস ধরে এঁটো ডান হাতের কব্জি গ্লাসের তলায় ঠেকিয়ে ঢক ঢক করে অনেকটা পানি খাচ্ছে। গ্লাস নামিয়ে রেখে ভিখারি আবার ভাত খেতে শুরু করতো, তার উদাস চোখ তাকিয়ে থাকতো কোন অনির্দিষ্টের দিকে।

রানু জিজ্ঞেস করে, রান্না ভালো হয়েছে?

হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস না করলে তো বলতে না। খুশি করার জন্যে বলছো?

অনেকে আগ বাড়িয়ে রান্না ভালো হয়েছে বলতে পারে। বিজু কেন যে পারে না! তার ধারণা, খাওয়ার ধরণ দেখে বোঝার কথা রান্নাটা সে পছন্দ করে খাচ্ছে, নাকি শুধু গিলে যাচ্ছে! মুখ ফুটে বলতে হবে? নিজের বউকেও? অন্য মানুষের বাড়িতে হলে আলাদা কথা।

রানুর কথায় বলে, খুশি করার জন্যে বলবো কেন? সত্যি, তাই বলছি।

আরেকটু মাংস নাও। মাছভাজা দিই একটা?

বিজু চোখ তুলে রানুকে দেখে। আস্তে আস্তে বলে, একটা কথা বলবো রানু?

জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে তাকায় রানু, কী কথা?

ম্লান হেসে বিজু বলে, জানো এই যে তুমি এখন সামনে বসে আছো, আমার খেতে খুব অস্বস্তি হচ্ছে।

নার্ভাস একটা হাসি ফোটে রানুর মুখে। বলে, আমি থাকলে অস্বস্তি হবে কেন?

না, অনেকদিন অভ্যাস নেই তো! একা একা খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

একটু চুপ করে থাকে রানু। চোখ নামিয়ে ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে টেবিলে কিছু একটা খুঁটছিলো। শ্বাস ফেলে অস্পষ্ট করে বলে, আমাদের সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়ালো, বলো তো!

আমিও তাই ভাবি, রানু। মনে হয়, এরকম হওয়ার কথা ছিলো না। খুব ভেবে দেখলে কিন্তু সত্যিকারের বড়ো কারণও কিছু পাওয়া যাবে না। তবু এটাই সত্যি এখন।

আমি তাহলে উঠে যাই?

তোমাকে উঠে যেতে কিন্তু বলিনি রানু। ভুল বুঝো না, কথাটা বলা দরকার মনে হলো তাই বলা।

রানু চেয়ারে গা এলিয়ে ডাইনিং টেবিলের ওপরে সিলিং-এ ঝোলানো আলোর ডুমটার দিকে তাকিয়ে থাকে। চশমার আড়ালে রানুর চোখ কি ভিজে ওঠে? নাকি দেখার ভুল! 'ইফ ইউ ডোন্ট নো মি বাই নাউ, ইউ উইল নেভার নেভার নেভার নো মি... নো, ইউ ওন'ট।'

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা রানুর হাতে চোখ পড়ে। শুধু হাত ধরাধরি করে পাশাপশি বসে থাকা – কতোদিন হয় না! ভালো করে দেখাও হয়নি অনেকদিন, আরো দশটা হাত পাশাপাশি রাখলে এখন হয়তো রানুর হাত আলাদা করে চিনতেও পারবে না বিজু।

কবে সে এক আশ্চর্য সময় ছিলো, এই হাতের একটুখানি স্পর্শের জন্যে আড়াল খোঁজা, নিঃশব্দে হাত ধরে কথা বলার চেয়েও বেশি কথা বলা – এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার ছিলো না। সময়ে চাওয়াগুলো পাল্টে যায়, ভালো লাগা, ভালোবাসাও নতুন মাত্রার সন্ধান করে।

সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে বললো রানু, বিজুও ভেবেছে কতোবার! তবু মনে হয়, এর ভেতরেও কি ভালোবাসা নেই? ভালোবাসা কোনো বদ্ধ জলাশয় নয়, সময়ে সেও পাল্টায়। নতুন পলি পড়ে, চর জেগে ওঠে কোথাও। উদ্দাম স্রোতে পাড় ভাঙে কোথাও, গভীর চোরাস্রোতের থৈ পাওয়া যায় না।

হয়তো পুরনো ভালোবাসাও আগের খোলস ছেড়ে নতুন চেহারা নিয়েছে এখন। তাই যদি হবে, পুরনো দিন ভেবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলা কেন! এই বদলটা মানতে মন চায় না, তা-ই বা কেন!

বিজুর খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেছে। গ্লাস তুলে অনেকটা পানি খায়, প্লেটে পড়ে থাকা অবশিষ্ট ভাতগুলোর ভেতরে আঙুল দিয়ে এলোমেলো নকশা কাটতে থাকে। কয়েক বছর আগে হলেও হয়তো সে রানুর নাম লিখতো। বুয়েটে যখন রানু ক্রমশ তার জীবনের ভেতরে ঢুকে পড়ছিলো, সেই সময় বিজু হাতে কাগজ-কলম পেলেই রানুর নাম লিখতো – একবার, দু'বার, শত শতবার। কোনো কারণ নেই, ভেবেচিন্তেও নয়। কী অদ্ভুত ঘোরলাগা সময় ছিলো তখন! অর্থহীন বোকামির মধ্যেও কতো রোমাঞ্চ!

মনে আছে, একবার রানুর জন্মদিনে বিজু নিজের হাতে একটা কার্ড বানিয়েছিলো। কার্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড হলুদ রঙে আগাগোড়া ছোপানো, ঠিক মাঝখানে লাল মার্কারে বড়ো

বড়ো অক্ষরে লিখেছিলো, আজ তোমার দিন, শুভ হোক, মঙ্গল হোক। আর পুরো কার্ড জুড়ে বিভিন্ন রঙের কালিতে ছোটো ছোটো করে লিখলো, রানু রানু রানু রানু...। সেই কার্ড রানুকে কী মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত করেছিলো!

খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ে বিজু। অভ্যাসমতো প্লেট হাতে তুলে নিয়ে ময়লা ফেলার পাত্রে এঁটো ভাতগুলো ঢেলে দেয়। অন্নকষ্টের দেশের মানুষ, প্রথম প্রথম খাবার ফেলতে গেলে বাধো বাধো ঠেকতো। এখানে ঘরে ঘরে, হোটেল-রেস্টুরেন্টে আর ফাস্ট ফুডের দোকানে যে কী পরিমাণ খাবার ফেলে দেওয়া হয়, না দেখলে বিজুর বিশ্বাসই হতো না। এখন আর কিছু মনে হয় না, সয়ে গেছে। প্রাচুর্যের হাত ধরে অপচয় আসে।

সিঙ্কে পানি ছেড়ে সাবান দিয়ে প্লেট ধুয়ে ফেলে বিজু। ফুলটুসের জন্মের বছরখানেক পরে বিজুর মা এসেছিলো নাতনিকে দেখতে। বিজুকে নিজের হাতে বাসনকোসন ধুতে দেখে মা খুব আশ্চর্য হয়ে বলে, পুরুষমানুষ এসব কাজ করে নাকি!

বিজু হাসতে হাসতে বলেছিলো, এখানে আর নূরুর মা বুয়াকে কোথায় পাবো, মা?

তাই বলে তোকে করতে হবে?

আমি একা না মা, এ দেশে সবাই করে। আর একটা-দুটো প্লেটের জন্যে ডিশওয়াশার চালানোর কোনো মানে হয় না। রানুর জন্যে রেখে দেবো, তা কি ঠিক? ও-ও আমার মতো বাইরে কাজ করে সারাদিন। ঘরে এসে বাচ্চা সামলায়, রান্নাও আমি করি না। এইটুকু না পারলে চলবে কী করে?

তুই আবার রান্না করবি কি?

বিজু বলে, একেবারে যে পারি না তা নয়। শিখে নিয়েছি। এ এমন এক দেশ মা, এখানে ঘরের কাজ বাইরের কাজ সব ভাগাভাগি করে করতে হয়। আমি পুরুষমানুষ বলে যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, রানুর অবস্থা কী হবে ভেবে দেখো তো!

মা তবু মানতে পারেনি। পারার কথা নয়, সারাজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অন্যরকম শিখিয়েছে। মা বলেছিলো, এতো কষ্ট করে এখানে থাকার তাহলে দরকার কী তোদের? দেশে চলে এলেই পারিস।

বিজু এক পায়ে খাড়া। এ দেশে তার মন বসেনি কোনোদিন, আসতেও সে চায়নি। তাকে আসতে হয়েছিলো, মা জানে। এখন ফিরে যাওয়ার কথা বললেও সিদ্ধান্ত তার একার হবে না, ফুলটুসের জন্মের পর তার জীবনের অংশীদার আরো একজন বেড়ে গেছে। এসব মাকে বলার মানে হয় না। বলে, তার চেয়ে তুমি চলে এসে আমাদের সঙ্গে থাকো। বাবা নেই, বড়ো ভাইও বাইরে।

তোর বাবা নেই, তার কবরটা আছে!

এই কথার জবাব হয় না। বাবার কবর এখানে তুলে আনা যাবে না। বিজু জানে, মায়ের এখন শুধু অপেক্ষা, বাবার কাছে কবে যেতে পারবে। মৃত্যু বাবাকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু মা খুব বেশিকাল আর আলাদা থাকতে চায় না।

মা কী বুঝেছিলো কে জানে। মানতে পারছিলো না, তা অস্পষ্ট থাকেনি। শেষমেষ বলেছিলো, আমি যে ক'দিন আছি, তোকে বাসন ধুতে হবে না। আমি করে নেবো।

তা মা করেছিলো। মাস দেড়েক ছিলো সেবার, এর বেশি তাকে রাখা যায়নি। যতোদিন ছিলো, বিজুকে রান্নাঘরে বা ধোয়াধুয়ির মধ্যে যেতে দেয়নি একেবারে।

প্লেট ধুয়ে পানি খেতে খেতে বিজু দেখে, রানু উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখে বিষণ্নতার মেঘ। ধীর পায়ে সোফায় গিয়ে বসে রানু। টেবিলে খাবার দেওয়ার সময় টিভি বন্ধ করে উঠে এসেছিলো, রিমোট চেপে আবার অন করে দেয়।

'দ্য কোল্ড রিমেইনস অব হোয়াট বিগ্যান উইথ আ প্যাশনেট স্টার্ট।'

৮

আমার ভালো কিছু হোক, তুমি চাও না। তাই তো?

ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় খুবই ভালো রেজাল্ট করেছিলো রানু। পড়াশোনায় সে বিজুর চেয়ে ভালো, কিন্তু শেষ পরীক্ষার ফল সম্ভবত রানুর নিজের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যায়। পরীক্ষার বেশ আগে থেকে আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে লেখালেখি শুরু করেছিলো, বিজু জানতো। বিশেষ পাত্তা দেয়নি।

দিতে হলো রেজাল্টের মাস তিনেক পরে টেক্সাসের এক ইউনিভার্সিটি থেকে রানুর মাস্টার্সের জন্যে স্কলারশীপের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেলে। বিজু চাকরিতে ঢুকেছিলো বিয়ের পরপরই। স্কলারশীপের জন্যে লেখালেখির পাশাপাশি রানু নিজেও চাকরির চেষ্টা করছিলো। কাগজপত্র আসতেই তা বন্ধ।

বিজু যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে, ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখছো কেন? ভালো করে ভেবে দেখো। তুমি আরো পড়াশোনা করতে বাইরে যদি যাবে, আমরা বিয়ে পরেও করতে পারতাম। তুমি আমেরিকায় যাবে, আমি এখানে – কেমন হচ্ছে ব্যাপারটা?

কথা হচ্ছিলো রাতে বিছানায় শুয়ে। বিজু দু'হাত ভাঁজ করে মাথার নিচে দিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া। রানু ডান কাৎ হয়ে, বিজুর দিকে মুখ।

আমি তোমাকেও সঙ্গে যেতে বলছি।

ওরা স্কলারশীপ তোমাকে দিয়েছে, আমাকে নয়।

রানু বলে, চেষ্টা করলে তোমার পড়াশোনারও একটা ব্যবস্থা করা যাবে, আমি জানি।

তোমার জানাটা ভুলও হতে পারে, রানু।

যদি লেখাপড়ার ব্যবস্থা না হয়, তোমার নিজের লাইনে কাজকর্ম খুঁজে নিতে পারবে।

বিজু মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলে, আমার জন্যে কি ওরা চাকরি নিয়ে বসে আছে?

রানু হাসে না, তুমি আগে থেকেই এরকম কথা বললে কী করে হবে? চেষ্টা করা যায়।

রানু তুমি বুঝতে পারছো, এটা ঠিক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যাতায়াতের মতো ব্যাপার নয়? আমাকে যেতে হলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানকার পাট গুটিয়ে যেতে হবে। আমি বলছি না এই চাকরি আমার জীবনের মোক্ষ। কিন্তু এটা আমার ক্যারিয়ারের সঙ্গে জড়িত। তোমার লেখাপড়া শেষ হলে ফিরে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, তা ভেবে দেখেছো?

না-ও ফিরতে পারি। একেবারে চলে গেলে ক্ষতি কী?

এই ভাবনার সঙ্গে বিজুর পরিচয় ছিলো না। বন্ধুরা অনেকে বিদেশে চলে গেছে, কেউ কেউ চেষ্টায় আছে। কিন্তু নিজে দেশের বাইরে কোথাও স্থায়ীভাবে চলে যাবে এমন কোনোদিন সে ভাবেইনি। বলে, লাভ-ক্ষতির কথা জানি না, তবে এতে আমার সায় নেই।

ছেলেভোলানোর কায়দায় রানু হঠাৎ বিজুর গলা জড়িয়ে ধরে খুব মিষ্টি গলায় বলে, আমি বললেও না?

রানু তুমি বোঝার চেষ্টা করো। ঝোঁকের মাথায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

ঝোঁকের মাথায় নয়। চিঠি লেখালেখির শুরু থেকে জানি, আমি এ দেশে থাকবো না।

কিন্তু জিনিসটা এখন আর শুধু আমি বলে কিছু নেই, আমরা বা আমাদের।

রানু হাল ছাড়ে না। গাঢ় গলায় বলে, আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয় বিজু। বলে, তার মানে আমি না গেলেও তুমি যাচ্ছো, এই তো?

হ্যাঁ। তুমি যাবে কিনা তা তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি যেতে না চাইলে আমাদের সম্পর্ক কোথায় যাচ্ছে ভেবে দেখেছো?

রানু স্পষ্ট গলায় জানায়, তোমাকে ছেড়ে একা যাওয়ার কথা কিন্তু আমি একবারও ভাবিনি, বলিওনি। যা কিছু ভেবেছি, দু'জনকে নিয়ে। এখন তুমি যদি আমাকে একা ছেড়ে দাও, তার জন্যে আমি দায়ী হতে যাবো কেন?

ছোটোবেলায় একবার নানাবাড়ির ঘাটে বাঁধা নৌকায় বসে একা একা বৈঠা নিয়ে খেলা করছিলো বিজু। ঘাটে আর কেউ নেই। হঠাৎ হাত ফসকে বৈঠা পানিতে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে তুলতে গিয়ে নিজে পানিতে পড়ে গিয়েছিলো সে। সাঁতার তখনো জানে না বিজু। কেউ একজন ঘাটে আসছিলো তখন, দেখতে পেয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটা তাকে তুলে এনেছিলো।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কিন্তু নদীর পানিতে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পেয়েছিলো, দম বন্ধ হয়ে আসা জিনিসটা কী। এখন রানুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই অনুভূতি স্পষ্ট মনে আসে বিজুর।

শ্বাস ফেলে বিজু বলে, কিন্তু যাওয়ার সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তোমার। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো তুমি একাই। কথা বলে দু'জনে ভালোমন্দ যাচাই করে ঠিক করা যেতো।

একটা সুযোগ এসেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবেই তা হাতছাড়া করতে চাইনি। তোমাকে নিয়েই যেতে চেয়েছি। তুমি না কোরো না, লক্ষ্মীটি। সময় আছে হাতে, ভেবে দেখো।

রানু এগিয়ে এসে বিজুর বুকে মাথা রাখে। বিজু টের পায়, একটা চোরা স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে। অসহায় একটা বোধ তাকে অবশ করে দিচ্ছে।

মুরুব্বিরা সবাই এক গলায় বলে, সুযোগটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এরকম সুযোগ প্রতিদিন আসে না, আর পায়ই বা ক'জন? একবার গেলে বিজু নিজেও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে।

বিজুর আর পড়াশোনা করার ইচ্ছে নেই, কিন্তু রানু একা চলে যাবে তা-ও ঠিক মনে হয় না। দাম্পত্য বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যে তো নয়, একত্রে বসবাসের বাসনায় মানুষ বিয়ে করে।

বিয়ের আগে এই স্কলারশীপের ব্যাপারটা ঘটলে কী হতো? বিয়ে স্থগিত হয়ে যেতো? অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হতো শুধু? বিজু জানে, কোনোকিছুই পাল্টাতো না, বিয়ে অনিবার্য ছিলো। তখন রানু যাওয়ার আগে বিয়ে সেরে ফেলতে চাইতো তারা দু'জনেই। ফলাফল এখন যা হতে যাচ্ছে তা-ই হতো। আমেরিকা যাত্রায় রানুর সঙ্গী না হয়ে বিজুর উপায় কী?

৯

ধূমপায়ীরা আহারের পরের সিগারেটটি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে। ব্যতিক্রম দেখেছে বিজু বাবাকে। খাওয়ার পরে বাবা সিগারেট ধরানোর জন্যে অপেক্ষা করতো প্রায় আধঘণ্টা। তার আগে চাই মিষ্টান্ন। ঘরে তৈরি পায়েস হোক বা দই, কিংবা দোকানের রসগোল্লা-সন্দেশ। একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত এই নিয়ম ছিলো, ব্যতিক্রম হয়নি। বিজু মিষ্টি খেতে একেবারে পছন্দ করে না, তার পছন্দ খুব ঝাল।

বিজু প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার হাতে নেয়। বসার ঘরের টিভির পাশে কাচের স্লাইডিং ডোর, দরজায় লম্বালম্বি ব্লাইন্ড। ঝোলানো সরু রশি টেনে পর্দা সরিয়ে দেওয়ার মতো ব্লাইন্ড খানিকটা সরিয়ে ভারী স্লাইডিং দরজা ঠেলে বাইরের বারান্দায় এসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

এ দেশে এই বারান্দার নাম প্যাটিও। বুকসমান উঁচু করে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা, ওপরে ছাদ। বারান্দায় আলো জ্বালানোর দরকার হয় না। কাচের দরজা দিয়ে বসার ঘরের আলো খানিকটা আসে। বাইরে একটু দূরে রাস্তার আলো। প্যাটিওর একপাশে গোটাকতক চেয়ার আর একটা গোলাকার টেবিল। প্লাস্টিকের, রোদবৃষ্টিতে এগুলোর কিছু হয় না। আরেক পাশে বারবিকিউ গ্রিল, ফুলটুসের ট্রাইসাইকেল, রাজ্যের বাতিল হয়ে যাওয়া খেলনা।

আর আছে রানুর শখের ছোটোবড়ো নানা আকারের টবে লাগানো প্ল্যান্ট। কোনো কোনোটা শীত সহ্য করতে পারে না, তখন টেনে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। প্ল্যান্টগুলো নিয়ে রানু একটু মনে হয় বাড়াবাড়িই করে। একসময় এমন হলো, প্যাটিও আর বসার ঘর প্রায় পুরোটা প্ল্যান্টে আর টবে সয়লাব। পা ফেলার জায়গা হয় না। বসার ঘরে টিভির মাথায়, সোফাগুলোর ফাঁকে-ফোকরে, দেয়ালের ধার ঘেঁষে, এমনকী স্টিরিও সিস্টেমের দুই স্পীকারের ওপরে দুটো টব বসে গেলো।

এক ছুটির দিনে দুপুরে রানু লিভিং রুমে বসে টিভি দেখছিলো। বিজুকে ঘুরঘুর করতে দেখে আদুরে গলায় বলে, আমার পাশে এসে একটু বসো না!

দাঁড়াও, আমার একটা ইমেল পাঠাতে হবে এক্ষুণি।

একটু পরেই না হয় করলে।

বিজু গম্ভীর মুখ করে বলে, আমি লিভিং রুমে আজকাল কেন বেশিক্ষণ বসি না জানো?

রানু প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায়। বিজু ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করে বোধহয়। বলে, না তো। কেন?

বিজু বলে, কিছুক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে তুমি একটা টব এনে আমার মাথার ওপরে বসিয়ে দেবে, এই ভয়ে!

খুব নির্দোষ, নিষ্কণ্টক হাসাহাসি হয়েছিলো খানিকক্ষণ।

ইঙ্গিত রানু বুঝেছিলো। পরের উইকএন্ডে কিছু টব বসার ঘর থেকে বিদায় হলো। তবু এখনো নেহাত কম নেই। সকালে উঠে রানু প্রথম প্ল্যান্টগুলোকে পানি খাওয়ায়। আহা, মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো যদি এরকম একটু যত্ন পেতো!

বিজুর হঠাৎ মনে হয়, আচ্ছা প্ল্যান্ট শব্দের বাংলা কী? গাছ বললে খুব অবিচার হয়। গাছ বললে একটা শক্তপোক্ত ছায়াময় জিনিস মনে আসে। লতা? লতা নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না, কোনোকিছুকে আশ্রয় করে লতিয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে লতা জিনিসটার মধ্যে বেশ একটা কোমল নরম-সরম মেয়েলি ব্যাপার আছে। কিন্তু এগুলো টবে দিব্যি নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো মেয়েলি নয়? মানিপ্ল্যান্ট আবার লতা। প্ল্যান্ট তাহলে দু'রকমেরই হতে পারে, লতা আবার শুধুই মেয়েলি।

বারান্দার পাশে তরুণ বয়সী একটা গাছ বেড়ে উঠছে। কী গাছ, কে জানে! বিজু গাছপালা তেমন চেনে না। আম-কাঁঠালের গাছ চেনে। পাইন-ইউক্যালিপটাস না চেনার কোনো কারণ নেই। আর চেনে বটগাছ। 'বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে...।' বটবৃক্ষ না বললে ঠিক মানায় না, গাছ বললে তার বিশালত্ব অধরা থাকে।

কোনো কোনো জিনিসকে অনেক সময় চলতি নামে বললে বেড় পাওয়া কঠিন হয়। একবার নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া হয়েছিলো। ফুলটুস তখনো পানিকে মাম বলে। যে কোনো বিখ্যাত ও দর্শনীয় জায়গায় যাওয়ার কথা উঠলে বিজুর ধারণা হয়, পরে মনে হবে কী হতো না দেখলে? জলপ্রপাত কখনো দেখা ছিলো না। আগ্রহও খুব একটা ছিলো না – অনেক উঁচু একটা জায়গা থেকে নিচে সশব্দে পানি পড়ছে, এই তো। এর মধ্যে আর দেখার কী হলো!

কিন্তু নায়াগ্রার প্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধতা গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। কী অবিশ্বাস্য, বিশাল ও আশ্চর্য সেই সুন্দর! এখানে মাম বা পানি বা জল বললে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। জলরাশি বললেও হালকা লাগে। জলধি বরং খানিকটা মানায়, কিন্তু অভিধানে তার অন্য অর্থ লেখা আছে।

সিগারেট ধরিয়ে চেয়ার টেনে বসে বিজু। রানু আসবে? একসময় রাতের খাওয়ার পরে দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসা হতো আধো অন্ধকার প্যাটিওতে। শীতের সময় অবশ্য বাইরে বসা যায় না, তখন বসার ঘরে। খুব শীতে চায়ের বদলে কফি, ঠাণ্ডায় কফিটা যায় ভালো।

বিজু আজকাল চা-কফিতে দুধ-চিনি নেয় না। প্রথমে দুধ ছেড়েছে, তারপরে চিনি। প্রথম প্রথম বিস্বাদ লাগতো, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। রানুর সঙ্গে সম্পর্কের মতো? একটা-দুটো করে মধুর-সুন্দর ব্যাপারগুলো ঝরে যেতে শুরু করেছে। হোক অনিচ্ছায়, হয়ে গেছে তো।

চূড়ান্ত সিনিকের মতো কখনো কখনো বিজু ভাবে, ভালোবাসাবাসি জিনিসটা আসলে চুইংগামের মতো – প্রথম প্রথম ভারি মিষ্টি, তারপর একসময় স্বাদ চলে যেতে থাকে, চলে যায়ও, যেহেতু তার নিয়তিই চলে যাওয়া, তখন শুধু অভ্যাসবশে চিবিয়ে যাও যতোক্ষণ না ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার সুযোগ ঘটছে!

ঘাড় ঘুরিয়ে বসার ঘরে তাকায় বিজু, রানুকে দেখা যায় না। হয়তো রান্নাঘরে। চা বানাতে গেছে? বিজু সিগারেটে মন দেয়। শেষ হওয়ার পরও খানিকক্ষণ বসে থাকে। তখনো আশা থাকে, যদি রানু আসে চা নিয়ে। আসে না, আসবে তার কোনো লক্ষণও নেই। উঠে পড়ে বিজু।

শরৎকালের শুরু থেকে সন্ধ্যার পরে একটু শীত শীত করে, শেষরাতে ঘুমের মধ্যে কম্বল খুঁজতে হয়। বাংলাদেশের মতো এদের শরৎ-হেমন্ত ঋতু আলাদা করা নেই, একত্রিত হয়ে গেছে ফল নামে। স্কুলে পড়ার সময় শরৎকালের ইংরেজি অটাম শিখেছিলো। এ দেশে এসে শিখলো, ফল। ফল-এর একটা অর্থ হয় পতন। প্রেমে নিপতিত হলে ফলিং ইন লাভ। প্রেমের অন্তর্ধানও আরেক পতন, তখন কী বলা হবে? ফল ফ্রম গ্রেস? স্বর্গ হইতে বিদায়?

১০

বিজু অফিস থেকে ফিরেছে, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রিকশা থেকে নামতে গিয়ে প্যান্টের বাঁ পকেটের কাছে ছিঁড়ে গেছে। খুব প্রিয় ছিলো প্যান্টটা, মাত্র মাসখানেক আগে রানু কিনে দিয়েছিলো এলিফ্যান্ট রোডের এক দোকান থেকে।

রানু বিছানায় শুয়ে ছিলো, এই অসময়ে তার শুয়ে থাকা স্বাভাবিক নয়, একটু অবাক হয় বিজু। কাছে আসতে রানু পাশ ফিরে শোয়। খুব ক্লান্ত গলায় বলে, তুমি না বলেছিলে, সাবধানের মার নেই, নাকি মারের সাবধান নেই!

কেন, কী হয়েছে?

হবে আবার কী? যা হওয়ার তাই হয়েছে।

খুলে বলবে তো! শরীর খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা শরীরের বটে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। পজিটিভ।

বুঝতে একটু সময় লাগে বিজুর। কিন্তু তাতে রানুর মন খারাপ হবে কেন? পেটে বাচ্চা আসাটা নিশ্চিত জানা হলে মেয়েরা খুশি হয় বলে এতোদিন জেনে এসেছে। রানুর প্রতিক্রিয়া কি সবসময় উল্টো হবে সবকিছুতে? ঝুঁকে পড়ে রানুর কপালে ছোটো করে চুমু দেয়, মুখে হাসি ফুটিয়ে বিজু বলে, ভালো খবর তো। কতোদিন?

ডাক্তার বললো আট সপ্তাহ।

তুমি কিছু বলোনি তো আমাকে!

নিজেই টের পাইনি, শুধু একটু সন্দেহ হচ্ছিলো। আর তোমাকে বলার কী হলো?

বাঃ, তোমার সন্দেহের কথাটাও বলতে পারতে।

মনে আছে, আমরা ঠিক করেছিলাম অন্তত তিন বছর বাচ্চাকাচ্চা নেবো না!

বিজু বলে, মনে থাকবে না কেন! সাবধানই তো ছিলাম আমরা, কী করে হলো কে জানে! কিন্তু তোমার খুশি হওয়া উচিত। ভালো খবর।

রানু শ্লেষের সঙ্গে বলে, তোমার জন্যে তো ভালোই, পৌরুষের প্রমাণ হয়ে গেলো।

বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম হলে পৌরুষের প্রমাণ হয়? জানা ছিলো না! এতোদিন জানতো এ ক্ষেত্রে মেয়েরা খুশি হয় তারা সন্তান ধারণে সক্ষম জেনে, সম্ভাব্য মাতৃত্বের অহংকারে।

বিজু বলে, রানু পুরুষমানুষের একার কৃতিত্বে বাচ্চা পৃথিবীতে আসে না। সেই কৃতিত্বের বেশিরভাগটা মেয়েদের, তা তুমিও জানো।

রানু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বিজু জিজ্ঞেস করে, কাউকে বলেছো?

না, ইচ্ছে করেনি। আর এক্ষুণি কাউকে জানাতেও চাই না, বিজু।

কী আশ্চর্য, কেন? এটা লুকিয়ে রাখা যাবে? দরকার কী?

কিন্তু এখন নয়, প্লিজ।

বিজুর বিভ্রান্ত লাগে। রানুকে সে বুঝতে পারছে না কেন?

রানু একটু থেমে বলে, জানো আমার খুব মন খারাপ লাগছে!

মন তোমার খারাপ হয়ে আছে দেখছি, কিন্তু কেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না রানু।

আমার স্কলারশীপের কী হবে? আমেরিকা যাওয়ার?

এই ঘটনা রানুর আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারটাকে নড়বড়ে করে দিতে পারে, বিজুর মাথায় আসেনি। চট করে মনে হয় এখন যদি রানুর সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায়, অন্তত স্থগিত করা গেলেও, মন্দ হয় না।

বিজু বলে, ওসব পরে ভাবা যাবে। তোমার শরীরের চিন্তা সবার আগে করা দরকার।

এবার সরাসরি আক্রমণে যায় রানু। বিজুর চোখের দিকে তীব্র চোখে তাকায়। বলে, তুমি ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে।

অপ্রস্তুত না হয়ে বিজুর উপায় কী? বিন্দুবিসর্গও জানা নেই, এমন কিছুর জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হলে আর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? বিনা দোষে অভিযুক্ত হওয়ার জন্যে ক্রোধ? ভালোবাসার ভুল ব্যাখ্যার জন্যে অভিমান? আক্রান্ত হয়ে পাল্টা আক্রমণের বাসনা?

এক এক করে সবগুলো অনুভূতি এক মুহূর্ত করে খেলে যায় বিজুর ভেতরে। কোনোটাকে স্থায়ী হতে দেয় না। ধীর গলায় বলে, একটা কথা তোমার বিশ্বাস করতে হবে রানু, আমি তোমার শত্রুপক্ষ নই।

রানু বলে, আমার ভালো তুমি চাও না। তাই আমেরিকা যেতে আপত্তি তোমার। আর কিছুতে আমাকে আটকাতে পারবে না বুঝে এখন পেটে বাচ্চা দিয়ে ধরে রাখতে চাও!

১১

বসার ঘরে রানু নেই, রান্নাঘরেও না। কোথায় সে? বাথরুমে? তাহলে বিজুকে অপেক্ষা করতে হবে গোসলের জন্যে। মেয়ের ঘরের পাশে ছোটো বাথরুমটাতে যাওয়া যায়, কিন্তু গোসলে বিজুর ব্যবহার্য সব শোয়ার ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে। এই ফাঁকে ইমেল কিছু এসেছে কি না, দেখে নিলে মন্দ হয় না।

সতেরোশো বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে দুটো বেডরুম আর আধখানা স্টাডি, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং স্পেস, দুই বাথরুম। স্টাডিটা ঠিক আধখানাই, আট ফুট বাই দশ ফুট জায়গার তিন দিকে দেয়াল, দরজা-জানালার কোনো বালাই নেই। দেয়ালের দু'দিক জুড়ে শেলফ তৈরি করা। ডেস্কের ওপরে বিজুর কমপিউটার আর তার যন্ত্রানুষঙ্গগুলো পরপর সাজানো। টেবিলে হরেক চেহারা ও আকারের কাগজপত্র – স্তূপাকার ও ছড়ানো। খোলা এবং না-খোলা কিছু কাগজমেল চোখে পড়ে বিজুর। কিছুকাল আগেও কাগজ ছাড়া আর কোনোভাবে যে চিঠি লেখা যায়, তা মানুষের কল্পনায়ও ছিলো না। ইন্টারনেট আর ইমেলের আগে মানুষ অফিস-টফিসে দ্রুত কাজ করতো কী করে? ভাবা যায়!

সব ইমেল যে কাজের তা-ও নয়। সেদিন একটা বিজনেস জার্নাল পড়ছিলো বিজু। বিশাল কোম্পানির সি ই ও লিখেছে, আমার থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে যে লোকটি বসে আছে তাকে আমি ইমেল করতে যাবো কোন দুঃখে? এ এক ভয়াবহ অপচয় – সময় এবং সম্পদের। অথচ হাজার হাজার মানুষ এই হাস্যকর কাণ্ডটি দিনের পর দিন করে যাচ্ছে। এর নাম প্রোডাক্টিভিটি, না আর কিছু?

বিজু অবশ্য জানে, দশ ফুট দূরে কেন, এক বিছানায় ঘুমানো দু'জন মানুষেরও কখনো কখনো ইমেল দরকার হতে পারে। বলার কথা যখন মুখ ফুটে বলতে বাধে, হৃদয়ঘটিত শর্টসার্কিটের ফলে যোগাযোগ থাকে অগম্য, সেই সময়ে চিঠির চেয়ে ভালো আর কী আছে?

টিভিতে অভিনব এক রেস্টুরেন্টের কথা শুনেছিলো – সেখানে আহার্য বা পানীয় কিছুই নেই, মেনুও নয়। চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, ছুরি-কাঁটাচামচ-প্লেট-ন্যাপকিনও দেওয়া হবে। সেখানে বসে শুধু কথা বলো। শুধু কথা বলার রেস্টুরেন্টের ব্যাপারটা মন্দ নয়। পৃথিবীতে কথা বলার সময় কমে গেছে ক্রমাগত। এই শহরে এরকম একটা থাকলে খুব কাজে লাগতো বলে বিজুর ধারণা। কিন্তু রানু কি রাজি হতো যেতে? এই রেস্টুরেন্টে যাওয়ার শর্ত যে কথা বলার আগ্রহ! না হলে তা আর কোন কাজে লাগবে?

কমপিউটার খুলে বিজু দেখলো ইনবক্সে অনেকগুলো ইমেল। বেশিরভাগই কাজ-সংশ্লিষ্ট, সাবজেক্ট লাইনে চোখ বুলিয়ে দেখে – ওগুলো কাল পড়লেও চলবে। গোটাতিনেক জাংক

মেল। পিত্ত জ্বলে যায়। এই বেনিয়ার দেশে সবাই কিছু একটা বেচতে চায়। তোমার দরকার আছে কি নেই, তাতে কী এসে গেলো? সবাই অবিশ্বাস্য কম দামে জিনিস দিতে চায়!

তারপরেও কথা আছে, এখন কিনে রাখো, পয়সা পরে দিও। এক্কেরে খাঁটি জিনিস, খাইয়া দাম দিয়েন, স্যার! কাবুলিওয়ালারা গল্পে-কাহিনীতে কুখ্যাত হয়ে আছে – আসল টাকায় তাদের আগ্রহ কম, সুদের টাকা ঠিকমতো পেলে খুশি। এ দেশও সেরকম কাবুলিওয়ালায় ভরা, তারাও আগে সুদের টাকা চায়, আসল পরে দেখা যাবে। এমন নয় যে আসল দিতে হবে না। দিতে হবেই, কিন্তু এমন ভাবভঙ্গি করা হবে যেন তোমাকে বাকিতে জিনিস দিয়ে তারা নিজেদের ধন্য করছে।

কমপিউটার থেকে উঠে পড়ে বিজু, ফিরে আসে বসার ঘরে। এখনো রানুর দেখা নেই। আশ্চর্য তো! পায়ে পায়ে শোয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে, ঘর অন্ধকার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে বাথরুমেও আলো জ্বলছে না। প্যাসেজ থেকে ছিটকে আসা আলোয় দেখা যায়, রানু বিছানায়।

ঘুমাতে যাওয়ার সময় সাধারণত রানু কাপড় পাল্টায়। বিছানার কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে বিজু দেখে, আজ পাল্টায়নি। দুটো মানে হতে পারে। মন ভালো লাগছে না বলে বা আলসেমিতে ওভাবেই শুয়ে পড়েছে। এমনিতে রানু গায়ে চাদর বা কম্বল কিছু একটা না জড়িয়ে ঘুমাতে পারে না। কম্বলটা পায়ের কাছে এখনো ভাঁজ করে রাখা। ধারণা হয়, একটু পরে উঠে পড়বে।

কোনো নড়াচড়া নেই, রানু আসলে ঘুমিয়ে গেছে কি না বোঝা যায় না। বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে গেলে কিছু শব্দ হবে এবং তা শোয়ার ঘরে পৌঁছাবে নিশ্চিত। রানু যদি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে, ঘুম ভেঙেও যেতে পারে। ওর ঘুম খুব পাতলা।

এখানেও প্রতিক্রিয়া দু'রকমের হতে পারে। যেহেতু বিজুর গোসল পূর্বনির্ধারিত, ঘুম ভেঙে গেলেও রানু বড়জোর পাশ ফিরে শোবে। কিন্তু আবার বলা যায় না, আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে রানুর মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে এবং বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসামাত্র বিজু একটা চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হতে পারে। অতিশয় দক্ষ তীরন্দাজ সে। হামলা মৌখিক, কিন্তু ঠিক কী প্রসঙ্গ দিয়ে শুরুটা হবে অনুমান করা সম্ভব নয় বলে চোরাগোপ্তা হামলার আশংকা মনে আসে।

যা হওয়ার হবে ভেবে বাথরুমে ঢোকে বিজু। নিঃশব্দে, প্রায় চোরের মতো। কোনো শব্দ না করে দরজা বন্ধ করে, তারপর বাথরুমের আলো জ্বালে। আগে জ্বাললে আলো সরাসরি রানুর চোখ লাগতে পারে। তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে বিজু ভাবতে অনিচ্ছুক আপাতত।

গোসল করে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। শেভ করে সামান্য ছেঁটেছুটে গোঁফের পরিচর্যা করে। রানু গোঁফ পছন্দ করে না। অনেক বলেকয়ে বিয়ের পরপর রানু একবার তার গোঁফ উচ্ছেদ করাতে সক্ষম হয়েছিলো অল্প কিছুদিনের জন্যে, তখনও পরস্পরের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। এখনও মাঝেমধ্যে কথা ওঠে।

গোঁফের ব্যাপারে আলাদা কোনো মোহ নেই বিজুর। গোঁফের আমি গোঁফের তুমি সমিতিরও একজন সে নয়। কেউ কেউ ওটাকে পৌরুষের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করে, বিজুর কাছে হাস্যকর মনে হয়। গোঁফ গজানোর বয়সে প্রথম থেকেই সে কামাতে শুরু করেছিলো। মা বোধহয় লক্ষ্য করছিলো, একদিন বলে ফেলে, মুসলমানের ছেলে গোঁফ কামাস কেন?

লাভ হয়নি, মা বলেছিলো বলে সে তখন গোঁফ রাখেনি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার পর অনেকটা খেয়ালের বশে কিংবা আলসেমিতে শেভ করা বন্ধ রেখেছিলো। চুলও নেমে যাচ্ছিলো ঘাড় ঢেকে। মাস দুয়েকের মধ্যে বিজুর চেহারা দাঁড়িয়ে যায় যৌবন বয়সের রবীন্দ্রনাথের মতো। তখনো মায়ের আপত্তি, কে কানে তোলে! বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার আগে চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলো গোঁফ বাঁচিয়ে। এখন গোঁফের চাষ চালু রেখেছে প্রতিবাদের ঝাণ্ডার মতো। রানু অপছন্দ বলে ছেঁটে ফেলতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে বিজু, খুবই সতর্কতার সঙ্গে, কোনো শব্দ না করে, যেভাবে ঢুকেছিলো। ঘরের আবছা আলোয় দেখে, রানু একই ভঙ্গিতে কাৎ হয়ে শোয়া। সন্দেহ হয়, সত্যিকারের ঘুম? নাকি শুধু চোখ মুদে পড়ে থাকা?

নাইট স্ট্যান্ডে রাখা ডিজিটাল অ্যালার্ম ঘড়িতে দশটা চল্লিশ। সকালের জন্যে অ্যালার্ম অন করা হয়নি। করলে নিচের দিকে একটা লাল ফুটকি জ্বলে থাকতো। রানু ভুলে গেছে, যদিও জানা নেই আবার সে উঠে পড়বে কি না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মনে করে অ্যালার্ম দিতে হয়। এতো বছর ধরে ভোরে উঠছে প্রতিদিন, অথচ এখনো অভ্যস্ত হওয়া হলো না। হবেও না মনে হয়।

বসার ঘরে এসে বিজু বেকুবের মতো, ভালো বাংলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। একসময় রাতে ফুলটুস ঘুমিয়ে গেলে দু'কাপ চা নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসে গল্পগাছা হতো। সারাদিনের কার্যবিবরণী, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, একটা-দুটো চুটকি। কখনো-সখনো কিছু সুইট-নাথিংস। পুরনো দিনের কোনো কোনো কথাও উঠে আসতো।

একটা শ্বাস চেপে বিজু ভাবে, সেসব দিন কবে গত হয়েছে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই আর! তবে নিজে চা বানিয়ে নিতে অসুবিধে নেই। চুলা জ্বালিয়ে কেতলিতে

পানি বসায় দু'কাপ আন্দাজে। যদি রানু উঠে আসে! পানি ফুটলে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে টি-ব্যাগে এক কাপ বানিয়ে নেয়। দুধ-চিনির ঝামেলা নেই, শুধু লিকার।

একবার ভাবে, দুধ-চিনিসহ আরেক কাপ বানিয়ে রানুকে ডাকলে কেমন হয়? খুব অবাক হবে নাকি সে? হয়তো হবে না, বিজু আগেও কখনো কখনো নিজে দু'জনের জন্যে চা বানিয়েছে। তখন সময় অন্যরকম ছিলো। তবু আজ ফিরে আসার পর থেকে বেশ অন্যরকম লাগছিলো রানুকে। কিছু ইঙ্গিতও কি ছিলো না? পরণে ঢাকাই শাড়ি...! বস্টন থেকে আনা আধখানা কাপ পেয়েও খুশি মনে হয়েছিলো। হাফ আ কাপ! বিজুর আচমকা মনে হয়, আধাআধি! সম্পূর্ণ আর নেই!

এখন চা বানিয়ে রানুকে ডেকে তোলার ইচ্ছে যেমন আছে, শংকাও ততোটা। অসময়ে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি রেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়? এই রাতদুপুরে তার কোনো দরকার নেই।

১২

বিজু খুলনা গিয়েছিলো কাল, ফিরেছে সন্ধ্যায়। বেড়াতে নয়, অফিসের কাজে যাওয়া। সুতরাং একাই। বাসায় ফিরে ওপরে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে রান্নাঘরে উঁকি দেয়, রানু আছে কি না দেখে। নেই, মা ছিলো। বাবা খাওয়ার টেবিলে, সামনে চায়ের কাপ আর সকালের বাসি খবরের কাগজ। সকালে অফিসে যাওয়ার তাড়ায় বাবার কাগজ পড়া হয় না, পড়ে বিকেলে ফিরে এসে চা খেতে খেতে।

মা বলে, কী রে এই এখন ফিরলি?

হ্যাঁ।

ঘরে গিয়ে দেখ তো, রানুর বোধহয় শরীর-টরীর খারাপ। সেই দুপুর থেকে শুয়ে আছে, ঘুমাচ্ছে। দুপুরে খেলোও না কিছু। বারকয়েক ডাকাডাকি করেছি, তাও এলো না। শুধু বলে মাথা ধরে আছে। পরে খাবো, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে যায় বিজু। অন্ধকার ঘরে আবছামতো দেখা যায়, রানু ডানদিকে কাৎ হয়ে শোয়া। একটা পাতলা কম্বল কোমর পর্যন্ত টেনে দেওয়া। পা টিপে টিপে বিছানার পাশে দাঁড়ায় বিজু। নিশ্বাসের শব্দে বোঝা যায়, গাঢ় ঘুম ঘুমাচ্ছে রানু। গায়ে হাত দিয়ে দেখবে ভেবেও দেয় না, অযথা ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই।

কাপড়চোপড় ছেড়ে একবারে গোসল সেরে নেয়। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে রানু একইভাবে ঘুমাচ্ছে। ওর ঘুম এতো গাঢ় নয়, বাথরুমে পানির শব্দে জেগে ওঠার কথা। বিজু সাবধানে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ে। এখন আর দ্বিধা না করে রানুর কপালে হাত রাখে। নাঃ, জ্বরটর নয়। তাহলে কী? শুধু মাথাব্যথায় এরকম কখনো হয়নি রানুর।

গর্ভাবস্থার কোনো সমস্যা কি না, ঠিক বুঝতে পারে না বিজু। মা বা অভিজ্ঞ অন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। রানু এখনো কাউকে জানাতে চায় না। তর্ক করার কিছু নেই, সময় হলে রানু নিজেই জানাবে বলেছে। এখানে বিজু শুধু সহযোগী, মূল ভূমিকায় রানু। সুতরাং তার সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।

রানু ক্ষীণ গলায় বলে, কখন ফিরলে?

এই তো একটু আগে। কী হয়েছে তোমার?

কিছু না, শরীর ভালো লাগছে না।

তোমার এমন গাঢ় ঘুম কখনো দেখিনি, তাই দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। মা বললো সারাদিন কিছু খাওনি তুমি।

কিছু চিন্তা কোরো না। তুমি বরং যাও, খেয়ে নাও।

এখন মোটে সন্ধ্যা হলো, পরে তোমার সঙ্গে খাবো।

তাহলে অন্তত চা খেয়ে নাও। এই সময় তোমার চা খাওয়ার অভ্যাস।

তুমিও চলো।

মাথাটা এমন ভারী হয়ে আছে! আমি আরেকটু শুয়ে থাকি?

রানুর অসুস্থতা তার শরীরের ভেতরের নতুন প্রাণীটির কারণে কি না, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয় বিজুর। সেদিনের অভিযোগের পরে এই বিষয়ে কথা বলা আরো দুরূহ হয়ে গেছে। বিজু জানে এই সময়ে মেয়েদের মানসিক চাপমুক্ত থাকা দরকার, যতোটা সম্ভব। কিন্তু আমেরিকার চাপ থেকে রানুকে বের করার সাধ্য তার নেই, সে বুঝে গেছে।

বিজু বলে, এখানেই চা দিয়ে যেতে বলি? চা খেলে তোমারও একটু চাঙ্গা লাগতে পারে।

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় সিদ্ধান্ত জানায় রানু, আমি এখন চা খাবো না। ইচ্ছে করছে না।

বিজু কথা বাড়ায় না। সমস্যা বোঝা যাচ্ছে না। আসলে শরীর খারাপ, নাকি বাসায় কারো সঙ্গে কিছু হয়েছে? কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকে সে রানুর পাশে। সদ্য বিবাহিতদের মধ্যে শরীরের যে তীব্র ও অবাধ আকর্ষণ থাকার কথা, এই কয়েক মাসে রানুর দিক থেকে তা হয়ে এসেছে নিয়ন্ত্রিত, অনেকখানি অনিচ্ছাপ্রসূত অংশগ্রহণের মতো।

এরকম হওয়ার কথা ছিলো না, শুরুতে ছিলো যেমন হওয়া স্বাভাবিক – উন্মোচন ও আবিষ্কারের উন্মাদনা যেন আর শেষ হওয়ার নয়। বিজুর উপলব্ধি, এই অবস্থাটা পাল্টে দিয়েছে আমেরিকা। রাষ্ট্র হিসেবে অবশ্য নয়, আমেরিকা নামের ধুন তাদের দাম্পত্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তছনছ করে দিচ্ছে সব। রচিত হয়ে যাচ্ছে ব্যবধান। বিজু অবশ্য এই দুর্ঘটকে সাময়িক বলে মনে করে। একসময় ভালোবাসাই আবার সব ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। 'লাভ উইল কংকার অল।'

উঠে পড়ে বিজু, নিচে নেমে আসে। রান্নাঘরে ঢুকে বলে, মা চা খাবো।

মা বলে, টেবিলে যা, দিচ্ছি। রানু কি এখনো ঘুমাচ্ছে? কী দেখলি, শরীর খারাপ?

এখন মাকে কী বলে বিজু! ভাবা উচিত ছিলো এই প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তাহলে নিচে নামতো না সে এখন।

টেবিলে এখন বাবা নেই, নামাজ পড়তে পাড়ার মসজিদে গেছে মনে হয়। বাসি খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে বলে, মনে হয়। খুব গভীর ঘুম, জাগাইনি। কপালে হাত দিয়ে জ্বরটর কিছু মনে হলো না।

মাথাব্যথার কথা বলছিলো। এরকম কখনো হয়নি, কিছু না হলেই ভালো।

রাতে খাওয়ার সময় মা গিয়ে ডাকাডাকি করে এলো, রানু উঠলো না। শুতে গিয়ে ঘরে ঢুকে বিজু টের পায়, রানু জেগে আছে। বলে, তুমি সারাদিন কিছু খেলে না, তোমার জন্যে খাবার এখানে দিতে বলবো?

নাঃ। রানু সংক্ষেপে জবাব দেয়।

বিজু বিছানায় এসে বসলে রানু জিজ্ঞেস করে, তুমি খেয়েছো?

হ্যাঁ।

সিগারেট খেলে না?

রানুর শরীরে ভ্রূণসঞ্চারের খবর জানার পর থেকে তার আশেপাশে ধূমপান বন্ধ করে দিয়েছে বিজু। এ ঘরে একেবারেই না। আজকাল খুব শোনা যায়, সিগারেটের পরোক্ষ ধোঁয়ায় পেটের বাচ্চারও ক্ষতি হতে পারে। সতর্ক হতেই হয়। নিজের বাচ্চা না? বিজু বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। মাথার নিচে বালিশটা ঠিক করে নিতে নিতে বলে, বাইরে খেয়ে এসেছি।

এখানেই খেতে পারতে।

রানুর কথায় কিসের সংকেত? বুঝতে পারে না। বলে, এ ঘরে আজকাল খাই না, তা তুমি জানো।

এখন থেকে আবার খেতে পারবে।

কী বলছো, বুঝতে পারছি না।

রানু খুব শান্ত গলায় বলে, যার জন্যে তোমার এতো সাবধান হওয়া, সে আর নেই।

চমকে ওঠে বিজু। বিছানায় উঠে বসেছে সে। বলে, কী হয়েছে রানু? কী বলছো?

ওটাকে বিদায় করে এসেছি।

অকস্মাৎ ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও হয়তো এতোটা বিস্ময় বোধ হতো না। নিজের ইচ্ছায় রানু এই কাণ্ড করেছে, বিশ্বাস হয় না। কী করে পারলো? তেমন ইচ্ছের কোনো আভাসও ছিলো না। নাকি ছিলো, বিজু বোঝেওনি। এইজন্যে বাচ্চা পেটে আসার কথা কাউকে জানাতে চায়নি? কেন এমন কাণ্ড করে বসলো রানু? বিজুরও সেখানে কিছু অংশীদারিত্ব ছিলো, একবার তার সঙ্গে কথা বলারও দরকার মনে করলো না? বললে

কী হতো? সে সম্মতি দিতো? নিশ্চয়ই নয় এবং রানু তা খুব ভালোই জানে। সুতরাং, পরামর্শ না করার একটা যুক্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু এই আজগুবি, উদ্ভট ও অর্বাচীন সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কী হয়? হয় না, কোনো ব্যাখ্যা হয় না। বিজু উদভ্রান্ত বোধ করে। এমন নয় যে ওই শিশুটির জন্যে তার কোনো অনুভূতি বা বোধ তৈরি হয়েছিলো। সে শুধুমাত্র একটা অশরীরী ধারণার মতো ছিলো, একটা অস্ফুট বোধ বা প্রাণের ধারণা, আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার কথা ছিলো তার। তাদের মিলিত ইচ্ছের প্রতিনিধি হয়ে ফুটে ওঠার কথা ছিলো। ছিলো কি? তাহলে এখন আর নেই কেন? রানু কী করে পারলো তাকে নিজের শরীর থেকে এমন মমতাহীনের মতো বিচ্ছিন্ন ও বহিষ্কার করতে? আমাকে তুমি কেন বিয়ে করলে-র মতো এই প্রশ্নও কি অমিমাংসিত থেকে যাবে?

কেন করলে রানু? নিজের গলার স্বরই বিজু যেন চিনতে পারে না।

অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। এই মুহূর্তে হয়তো চায়ও না।

রানু বলে, তুমি জানো আমি এখন বাচ্চা চাইনি।

তাই বলে তাকে মেরে ফেলতে হবে? বিজুর গলায় সামান্য ঝাঁঝ মেশানো।

বাচ্চাটা তোমার একার নয়, আমারও ছিলো, তাই না? বাধ্য হয়ে করতে হলো।

বিজুর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কীসে তোমাকে বাধ্য হতে হলো, রানু? কী এমন হয়েছিলো? আমার ওপরে রাগ? ঘৃণা? অভিমান? বলে না, চুপ করে রানুর ব্যাখ্যা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে।

আদালতে বিবাদীপক্ষের উকিলের মতো করে রানু বলে, বাধ্য হওয়ার কারণ আমার এবং তোমার ভবিষ্যত। বাচ্চা নিতে গেলে আমার এতো কষ্টে পাওয়া স্কলারশীপ ছেড়ে দিতে হয়। ভেবে দেখলাম, আমেরিকা যাওয়ার পরে বাচ্চা হলেও আমার পড়াশোনা করা আর হবে না। বাচ্চা আমরা পরেও নিতে পারবো, যখন চাইবো তখনই। আমেরিকার এই সুযোগ বার বার আসবে না বিজু। জানি আমাকে খুব নিষ্ঠুর ভাববে তুমি, স্বার্থপর ভাববে। কিন্তু এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারতো?

বিজুর বলতে ইচ্ছে হয়, সবচেয়ে ভালো হতো বাচ্চাটাকে জন্মাতে দিলে! কী হবে বলে? অসহায়ের মতো বালিশে মাথা এলিয়ে দেয়, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে সে।

দেসারুতে সমুদ্রের ধারে বসে এক সন্ধ্যায় ছেলেমেয়ে, ভবিষ্যত এসব নিয়ে কথা হয়েছিলো। রানু প্রথম ছেলে চায়, বিজু মেয়ে। ঠিক হয়েছিলো, ছেলে হলে নাম হবে

তাতাই, মেয়ে হলে টুপুর। বিজুর মনে হয়, যে চলে গেলো, সে কে ছিলো? তাতাই? না টুপুর? জানা হলো না! হবে না কোনোদিন।

অন্ধকার ঘরে এখন রানুর পাশে শুয়ে থেকেও কী অসীম দূরত্বের অনুভব! অকস্মাৎ নৈঃশব্দ ভেঙে, নিজেকে সামলাতে অপারগ হয়ে বিজু কেঁদে উঠেছিলো। বোধবুদ্ধি হওয়ার পর এমন কান্না সে কাঁদেনি কোনোদিন। পূর্ণবয়স্ক পুরুষমানুষের কান্না আসে, যখন তা হয় অপ্রতিরোধ্য ও অনিবার্য। যখন সে নিজেকে অসহায়, নিরুপায় দেখে। পরাজিত দেখে।

বিজুর কান্না সংক্রমিত হয়েছিলো রানুর মধ্যেও। বিজুর প্রতিক্রিয়া ঠিক এরকম হবে, সে হয়তো আশা করেনি। হয়তো তার মনে হয়েছিলো, বড়োজোর রাগারাগি করবে বিজু, অভিমান করে থাকবে কয়েকদিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে একসময়।

কিন্তু ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে বিজু, তা খুবই অপ্রত্যাশিত ছিলো রানুর কাছে। বিজুর এই কোমল অসহায় দিকটা তার আগে কখনো দেখা হয়নি। সে নিজেকে হয়তো প্রথমবারের মতো অপরাধী বোধ করে। মনে হতে থাকে, ঠিক হয়নি, মোটেই ঠিক হয়নি।

ততোক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে, কিছু করার নেই আর।

নিদ্রাহীন একটি দুঃসহ রাতও একসময় ভোর হয়। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে-বসে অস্থিরতায় রাত কাটে। বিজু শুধু একবার বলেছিলো, তুমি কী করে পারলে, রানু?

বলার কিছু ছিলো না, রানুর কাছে কোনো উত্তর ছিলো না!

আর কোনো কথা কেউ বলেনি। থাকলেও তা অনুচ্চারিত থেকে যায়।

১৩

চায়ের কাপ আর সিগারেটের প্যাকেট হাতে বারান্দা ওরফে প্যাটিওতে যায় বিজু। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসে। সিগারেট ধরিয়ে মনে পড়ে, অনেকদিন মা-র কোনো খবর নেওয়া হয় না। ফোন করা দরকার। সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঝুলিয়ে রেখে ভেতরে যায়। কর্ডলেস ফোন নিয়ে ফিরে আসে বারান্দায়। একবার ডায়াল করেই লাইন পাওয়া যায়।

বারো বছর আগে যখন এসেছিলো, সেই সময় বাংলাদেশে ফোনে লাইন পেতে কখনো কখনো পুরো এক বেলা লেগে যেতো। আজকাল সহজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ডিজিটাল ফোনের যুগ শুরু হওয়ার পর আরো সহজ হয়ে গেছে।

মা, আমি বিজু। কেমন আছো তুমি?

আছি, এই বয়সে যেমন থাকা যায়। এটা-ওটা লেগেই আছে। তা তোদের খবর বল।

আমরা ভালো আছি।

আমার ফুলটুস বোনটা কোথায় রে?

ঘুমিয়ে গেছে।

ও হ্যাঁ, তোদের ওখানে তো রাত এখন। ক'টা বাজে এখন?

এগারোটার কাছাকাছি। তোমার টুকিটাকি গোলমালের কথা কি বলছিলে?

ওই হাতে-পায়ে আর কোমরে একটু ব্যথা হচ্ছে ক'দিন ধরে।

ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?

এই নিয়ে কেউ ডাক্তারের কাছে যায়? ডাক্তার কী করবে? একগাদা ওষুধ লিখে দেবে, এই তো।

বাংলাদেশের বয়স্ক মানুষদের প্রায় সবাই বিষম রকমের চিকিৎসাবিমুখ। কেন, বোঝা যায় না। বিজুর ধারণা, এই অসুস্থতা বয়ে বেড়ানোর প্রবণতাও এক ধরনের রোগ। এ রোগের চিকিৎসা জানা নেই। বাবাও এরকম ছিলো। রানুর বাবা-মাও তাই। এ জীবনে দেশে যতো বয়স্ক মানুষ দেখেছে, এমন কারো কথা বিজু মনে করতে পারে না যে এক কথায় কখনো ডাক্তারের কাছে গেছে। অথচ এ দেশে যে কোনো বয়সী মানুষ সামান্য সর্দি হলেও ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়, সুস্থ থাকা এদের কাছে অনেক বেশি জরুরি।

বিজু বলে, তবু তোমার দেখানো দরকার।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আমার রানু মা কেমন আছে? কোথায় সে?

ঘুমিয়ে পড়েছে, বোধহয় শরীরটা ভালো নেই।

বোধহয় আবার কী রে? তুই জানিস না?

বস্টনে গিয়েছিলাম তিনদিনের জন্যে। আজ ফিরেছি। একটু আগে দেখি শুয়ে পড়েছে।

তুই কিছু বলিসনি তো?

রানুর সঙ্গে মনোমালিন্য বা মতান্তরের বিষয়ে বিজু মা-র কাছে কোনোদিন কিছু বলেনি। শুধু মা কেন, কাউকেই নয়। এসব তাদের দু'জনের শুধু, আর কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কারো কিছু বলার থাকতে পারে না, করারও নয়।

বিজু হালকা গলায় বলে, বা রে, আমি আবার কী বলবো?

আমার রানু মা খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে একদম কষ্ট দিবি না। তোরা বিদেশে পড়ে আছিস, কাছাকাছি নিজের মানুষ তেমন কেউ নেই।

বিজু হাসতে হাসতে বলে, কী আশ্চর্য, ওর তবু কাছাকাছি একটা বোন আছে। আমার তা-ও নেই। তুমিও ওর দলে গেলে আমি যাই কোথায়?

মা বলে, মেয়েদের কষ্ট তোরা বুঝবি না!

তর্ক করে লাভ নেই। রানু কী মন্ত্রপড়া দিয়েছে কে জানে, তার ব্যাপারে একেবারে অন্ধ মা। বিজু অবশ্য ব্যাপারটা উপভোগ করে। ছেলের বউয়ের জন্যে শাশুড়ির এমন টান দেখা যায় না। মা-র স্বভাবই এরকম। বড়ো ভাইয়ের বউয়ের বেলায়ও তাই। বিয়ের পর পর রানু একদিন মাকে বলে, শাশুড়ির সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবো, আপনার ছেলের কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে নালিশ করবো, বাপের বাড়ি গিয়ে শাশুড়ির নামে এক বস্তা নিন্দামন্দ করে আসবো – আপনি তো মা সে সুযোগ দিচ্ছেন না!

মা হেসে ফেলে, কারণ জানিস? আমার যে মেয়ে নেই, তোরা দু'জনই এখন আমার মেয়ে। নিজের মেয়ে থাকলে কীরকম হতো তা অবশ্য জানি না।

বিজুর মনে হয়েছিলো, ভেবে দেখার মতো কথা। গবেষণার বিষয় হিসেবেও মন্দ নয়।

ফোন রেখে দিয়ে চা শেষ করে বিজু। সিগারেট ধরায় আবার। রানু তাহলে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে? 'স্মোকড দ্য ডে'জ লাস্ট সিগারেট রিমেম্বারিং হোয়াট শী সেড...।'

শেষ কথা রানু কী বলেছিলো আজ সন্ধ্যায়? বলছিলো, কোথায় এসে দাঁড়ালো আমাদের সম্পর্ক। ঠিক, এ কোথায় এসে পড়লাম আমরা? এখানে এসে পৌঁছানো একদিনে হয়নি। ভুল বা দোষ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এক সময়ের নাব্য নদীতে এখন বিষণ্নতার পলি। উদ্ধার কীসে? বিজুর মনে হয়, উদ্ধার হয়তো এখনো অসম্ভব নয়।

১৪

নিজেদের সংসার শুরু হয়েছিলো আমেরিকা আসার পর। ইস্কাটনের বাসায় যা ছিলো, তাকে দাম্পত্যের শুরু বলা যায়, সংসারের নয়। ওটা মায়ের সংসার। বাইরের সব কর্তৃত্ব বাবার। ওখানে একদিনের জন্যে বাজারও করতে হয়নি বিজুকে, রানুকে এক কাপ চা বানিয়ে খেতে হয়নি কখনো।

ঢাকা এয়ারপোর্টে তাদের বিদায় দেওয়ার লোকের অভাব হয়নি। রানুর বাবা দু'জনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, মনে রেখো তোমরা কিন্তু যাচ্ছো ফিরে আসার জন্যে। জানি, যারা যায় তাদের অনেকেই আর ফেরে না। সিদ্ধান্ত তোমাদের নিজেদের, কিন্তু আমাকে একশোবার জিজ্ঞেস করলে একশোবারই তোমাদের ফিরে আসতে বলবো।

নিউ ইয়র্কের জে এফ কে-তে ওদের রিসিভ করার জন্যে কেউ ছিলো না। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক ছিলো, ইমিগ্রেশনে ঝামেলা হয়নি। ব্যাগেজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে চেনা মুখ দেখতে না পেয়ে ভারি অসহায় একটা অনিশ্চয়তার বোধ তৈরি হয়। এই অপরিচিত জায়গায় কোনো একটা চেনা মুখ না দেখলে তা হতেই পারে। কী করিলে কী হয় জাতীয় সংস্কারে বিজুর বিশ্বাস নেই, কিন্তু এই সময়টাকে চট করে খুব প্রতীকী বলে মনে হয়।

সম্পূর্ণ নতুন এক দেশে পৌঁছে যে সংবর্ধনার মুখোমুখি হতে হলো, তার ভেতরে কি কোনো সংকেত আছে? 'এলেম নতুন দেশে / তলায় গেল ভগ্নতরী কুলে এলেম ভেসে।' ভগ্নতরী তলিয়েছে ঠিকই, এখানে যে কেউ তোমার জন্যে অপেক্ষা করেও নেই! তোমাকে কেউ কি চায়! রানুর মুখের দিকে তাকায় বিজু, সেখানেও উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু লেখা নেই।

রানুর দূর সম্পর্কের এক মামার এয়ারপোর্টে আসার কথা। ফ্লাইটের বৃত্তান্ত যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, অথচ এখন তার দেখা নেই। হয়তো কোথাও আটকে গেছে, এসে পড়বে ভেবে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত জানায় রানু। ঘণ্টাখানেক পরেও কোনোকিছু বদলায় না, কোনো চেনা মুখ দেখা দিয়ে বলে না, স্যরি আমার একটু দেরি হয়ে গেলো।

দেখেশুনে এয়ারপোর্টের কর্মী মনে হয় এরকম একজনকে জিজ্ঞেস করে বিজু জেনে নেয় ট্যাক্সি কোথায় পাওয়া যাবে। আর যাই হোক, এয়াপোর্টে থানা গেড়ে বসে থাকা যাবে না, কোথাও পৌঁছাতে হবে এবং ট্যাক্সি ছাড়া গতি এখন নেই। বাস চলাচল দেখা যায়, কিন্তু কোন বাস কোথায় যায় কে জানে!

দু'জনে মালপত্র টেনে নিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসে। মানুষজন, গাড়িটাড়ি সব মিলিয়ে জায়গাটাকে ঢাকার গুলিস্তানের চেয়ে কম কিছু মনে হয় না বিজুর। শুধু রিকশা নেই, এই যা। সিগারেট খাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সেই কখন থেকে, কিন্তু এয়ারপোর্টের

ভেতরে সর্বত্র নো স্মোকিং লেখা দেখেছে। এখানে বাইরে অনেকের হাতে সিগারেট দেখে সাহস করে ধরিয়ে ফেলে একটা। রানু তার ব্যাগ থেকে মামুজানের ঠিকানা লেখা কাগজ খুঁজে বের করে।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে বেঁটেমতো মোটাসোটা লোক ট্যাক্সির খবরদারি করছিলো। বিজু পায়ে পায়ে এগিয়ে তার কাছে ঠিকানা লেখা কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, এই ঠিকানায় যেতে চাই আমরা। সাদা চামড়ার লোকটা হাসি হাসি মুখ করে বলে, এ দেশে এই প্রথম?

বিজু হ্যাঁ বললে সে বলে, দেখলেই ঠিক বুঝতে পারি। হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি দেখিয়ে ওদের উঠে পড়তে বলে সে। ঠিকানার কাগজ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, ড্রাইভারকে দিলেই হবে, সে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে দেবে।

ট্যাক্সির ভেতরে বসতেই, কী আশ্চর্য, ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলে, ঢাকাথিক্যা আজই আইলেন?

বিজুর ঠিকই মনে হয়েছিলো। এ জায়গাটা সত্যি গুলিস্তানের মোড়। ভিনদেশে এসে প্রথম ট্যাক্সিতে বাঙালি ড্রাইভার, তা বোধহয় শুধু নিউ ইয়র্কে সম্ভব। বিজু জিজ্ঞেস করে, কেমন করে বুঝলেন আমরা ঢাকা থেকে আসছি?

আপনাগো দেইখ্যাই বুজছি। কতা কইতেও তো হোনলাম।

ঠিকানা খুঁজে বারোতলা পুরনো একটা দালানের সামনে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। বলে দেয়, ভেতরে গিয়ে লিফটে সাততলায় উঠে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে নিতে হবে। দরজার ওপরে লেখা থাকবে নাম্বার।

দরজা খুলে দেয় একজন মধ্যবয়স্ক লোক। লুঙ্গিপরা, খালি গা। ভেতরে ঢুকে রানু বলে, মামা আপনার না এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা?

এই তাহলে মামা! মামা বলে, আর বোলো না...

বলার দরকার ছিলো না। বিজু পুরনো এক বন্ধুর ফোন নাম্বার জোগাড় করে এনেছিলো, সে ডালাসে থাকে বছর তিনেক। ফোনে বিজুর সব বৃত্তান্ত শুনে বললো, চলে আয়। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দু'দিন পরে ডালাস। বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে রানুর রেজিস্ট্রেশন, ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করা, পুরনো ফার্নিচারের দোকান থেকে কিছু ফার্নিচার কেনা হয়। সঙ্গে চাদর-বালিশ, বাসনকোসন এবং সংসার শুরুর জন্যে আরো সব। ডালাসে আসার দিন সাতেকের মধ্যে শুরু হয়েছিলো তাদের সংসার।

মাকড়সার জাল বোনার মতো বোনা হতে থাকে দিনযাপন, সংসার। একেকটা প্রয়োজনের লেজ ধরে দু'ঘর বুনে দেখা যায় আরো দুটো দরকার উঁকি দিতে শুরু করেছে। এই তাহলে সংসার। দেশে থাকতে বোঝা যায়নি, অনেককিছু হাতের কাছে তৈরি ছিলো। এখানে একেবারে শূন্য থেকে শুরু বলে প্রতিটি আঁচড় টের পাওয়া যাচ্ছিলো।

এ শহরে ট্রেন নেই, বাস যা আছে তা-ও না থাকার মতো। চলাফেরা সীমিত হয়ে ছিলো, বাসস্থান ক্যাম্পাস-সংলগ্ন হলেও রানুর পক্ষে হেঁটে ক্লাসে আসা-যাওয়া প্রায় অসম্ভব। বন্ধু নিজে অথবা তার বউ রানুকে ক্লাসে নামিয়ে দেয়, তুলে নিয়ে আসে। হাটবাজার করার দরকার হলেও ওদের বলতে হয় গাড়িতে নিয়ে যেতে। নাহলে সামান্য রুটি বা সিগারেট কিনতেও মাইলখানেক হাঁটো। পরান্মুখ হয়ে আর কতো থাকা যায়!

গাড়ি কেনা হলো। পুরনো। বিজু শখের বশে গাড়ি চালানো শিখেছিলো দেশে থাকতে, বাবার অফিসের ড্রাইভার শিখিয়েছিলো আগ্রহ করে। লাইসেন্স হয়ে যায়। বিজু এখন রানুকে ক্লাসে আনা-নেওয়া করতে পারে। গাড়ি কিনে হাতের টাকাপয়সায় টান পড়ে। হিসেব করে দেখা যায় দেশ থেকে আনা টাকায় আর বড়োজোর মাস দু'তিনেক চলতে পারে।

রানুর স্কলারশীপের টাকার পরিমাণ প্রথমে যথেষ্ট মনে হয়েছিলো, ক্রমে বোঝা যায় দু'জনের সংসার চালানোর জন্যে খুব একটা কিছু নয়। মোটামুটি চালানো হয়তো সম্ভব ছিলো যদি না নতুন পাতা সংসারে আজ এটা কাল ওটার দরকার হতো। সংসারে যে এতোকিছু লাগে কে জানতো!

রোজগারের ধান্দায় বিজুকে নেমে পড়তে হয়। বুয়েট পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার বলে এখানে বিশেষ পাত্তা পাওয়া যাবে না, অচিরেই বোঝা যায়। সে ধরনের কাজকর্ম খোঁজার কৌশল তার জানতে-বুঝতে সময় লাগবে আরো। ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টের কাজ সবচেয়ে সহজলভ্য, যার জন্যে বুয়েটের বিদ্যা তুলে রাখতে হয়। ফ্রিজার থেকে বের করা বরফ-জমাট মাংসের প্যাটি গ্রিলে ভেজে মেয়োনেজ-মাস্টার্ড-লেটুস-টমেটো-চীজ দিয়ে বারগার বানানো, টগবগে গরম তেলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

কাজে ঢুকে আরেক নতুন ঝামেলা, তার কাজ আর রানুর ক্লাসের সময় মেলে না। কয়েকমাস পয়সা জমিয়ে আরেকটা গাড়ি। তারপর রানুকে ড্রাইভিং শেখাও, লাইসেন্স করাতে নিয়ে যাও। ক্রমে রানু নিজে ক্লাসে যাওয়া-আসা করতেও শেখে।

একটা-দুটো করে ঘরের ফার্নিচার বাড়ে, পুরনোর বদলে নতুন আসতে থাকে। ঘরে ঢুকে পড়ে আর সব জিনিসপত্র। কিছু শখের, কিছু প্রয়োজনের। প্রয়োজন তৈরি করতে মনুষ্য প্রজাতির তুলনা হয় না। আরো প্রতিভাবান এ দেশের বিজ্ঞাপনের মানুষগুলো। কী করে যে

কোনো তুচ্ছ জিনিসকেও যে তারা দরকারি জিনিস ভাবিয়ে ছাড়ে! টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হবে, এই জিনিস ছাড়া এতোদিন জীবন চললো কী করে? এক্ষুণি না হলে চলছে না।

কেনা আর শেষ হয় না, শুধু কিনে যাও। আরো কিনতে আরো পয়সা চাই, রোজগার বাড়াও। রানুর ক্লাসে যাতায়াতের চিন্তা নেই, সুতরাং আরেকটা কাজ নিয়ে ফেলো। বিজুর দ্বিতীয় কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যায়, গ্যাস স্টেশনে।

বাইরে গাড়িতে গ্যাসোলিন ভরার পাম্প, ভেতরে ক্যান্ডি-সিগারেট-কোক-কফিসহ রাজ্যের জিনিসপত্রের পসরা। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা কনভেনিয়েন্স স্টোর। বিজুর কাজ রাত দশটা থেকে সকাল ছ'টা। রাতে খদ্দের কম থাকে, ব্যস্ততাও কম। খদ্দের দিনের তুলনায় অনেক কম হলেও কবরখানার স্তব্ধতা বা স্থবিরতা ঠিক নেই, তবু এর নাম গ্রেভইয়ার্ড শিফট। বসে থাকার জো নেই, কাজের ফর্দ করে দেওয়া আছে – ভেতরের এবং বাইরের সবকিছু ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে হবে, সবগুলো গারবেজ ক্যান খালি করো, শেলফের জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো, বাথরুম পরিষ্কার করো।

রাতজাগা কোনো সমস্যা নয়, শারীরিক পরিশ্রমও না, তবু এক ধরনের গ্লানিতে মন ভরে যায় এই কাজ করতে। ঝাড়পোঁছ করতে করতে বিজুর মনে হয়, আমি এখানে কেন, কী করছি? বাথরুমের কমোড-ফ্লোর পরিষ্কার করার সময় কান্না পেয়ে যায়। এই কাজের জন্যে সে পৃথিবীতে এসেছিলো!

দুটো কাজ নিয়ে টাকাপয়সার সংকট কাটে। কিন্তু রানুর সঙ্গে দেখা হয় কখন? বিজুর দিন শুরু হয় রাতের কাজ থেকে ফিরে, তখন রানু তৈরি হচ্ছে ক্লাসে যাওয়ার জন্যে। ঘণ্টাতিনেক ঘুমিয়ে নিয়ে ফাস্ট ফুডের কাজে যায় বিজু। সন্ধ্যায় ফিরে এলে তখন রানু রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। বিজু হতক্লান্ত শরীরে কিঞ্চিৎ বেড়াল-ঘুমের পর গোসল এবং খাওয়া সেরে নেয়, তারপর আবার গ্রেভইয়ার্ড শিফটের শুরু।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া কোথায় ভালোবাসিবার আর মরিবার অবসর! ভালো করে কেউ কারো চেহারাও দেখে না। দাঁতে দাঁত চেপে বিজু নিজেকে সচল রাখে – এ জীবন দোয়েলের ফড়িং-এর তো নয়ই, এমনকী মানুষেরও নয়। রানুর পড়াশোনা শেষ হওয়ামাত্র এ দেশ থেকে কেটে পড়তে হবে। রানুও আজকাল সেরকম ভাবতে শুরু করেছে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

মানুষের জীবনে নাটকীয়তাও বড়ো কম নয়। গ্রেভইয়ার্ড শিফটে কাজ করছে, এরকম এক রাতে দুটোর দিকে একজন খদ্দের একটা গ্যাস পাম্পের সামনে গাড়ি থেকে নামে। বিজু লক্ষ্য করে, লোকটা সম্ভবত ভারতীয়। গাড়িতে গ্যাস ভরা হয়ে গেলে লোকটা ভেতরে

আসে, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বলে আন্দাজ হয়। গাড়ি এবং পোশাক-আশাক দেখে মনে হয়, ভালো কাজকর্ম করে।

গ্যাসের দাম দিয়ে লোকটা বিজুকে জিজ্ঞেস করে, দেশ কোথায়?

বিজু উত্তর শুনে পরিষ্কার বাংলায় পরবর্তী কথা তার, আরে দেশী যে!

লোকটার তাড়া নেই মনে হয়, দিব্যি গল্প জুড়ে দেয়। কফি নিতে গেলে বিজু বলে, দাঁড়ান কফিটা পুরনো হয়ে গেছে। টাটকা বানিয়ে দিই।

কফি মেশিন চালু করে দিয়ে পরিচয় বিনিময় হয়। ভদ্রলোকের নাম আসাদউল্লাহ কবির, এ দেশে আছে প্রায় বিশ বছর। এসেছিলো পড়াশোনা করতে, শেষ করে থেকে গেছে। বিয়ে করেছে এ দেশীয় এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। দু'জনে মিলে একটা ব্যবসা চালায়। দুই ছেলেমেয়ে কলেজে পড়াশোনা করে। বিজু বুয়েট থেকে পাশ করেছে শুনে বলে, এখানে আপনি কী করছেন?

বিজু সংক্ষেপে তার কাহিনী বিবৃত করে। যোগ করতে ভোলে না, বউয়ের পড়াশোনা শেষ হলে দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে।

কফি তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। দুধ-চিনি মিশিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে আসাদউল্লাহ বলে, গুড লাক। ইচ্ছেটা মহৎ, স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার যাওয়া হচ্ছে না, তা এক্ষুণি সাদা কাগজে লিখে দিতে পারি।

বিজু হাসে, কেন?

শতকরা নিরানব্বুই জন ফিরে যাওয়ার বাসনা নিয়ে এ দেশে আসে। ফিরতে পারে সম্ভবত শতকরা এক-দুই ভাগ। দেখতেই পাচ্ছেন, আমিও ওই মেজরিটির দলে।

আমি খুব চেষ্টা করবো মাইনরিটি হতে।

বলেইছি তো, গুড লাক।

আসাদউল্লাহ পকেট থেকে বিজনেস কার্ড বের করে দেয় বিজুকে। বলে, যদি সত্যি সত্যি দেশে ফিরে যেতে পারেন, আমাকে ফোন করে জানিয়ে যাবেন।

বিজু ভাবে, অদ্ভুত মানুষ তো! কার্ডটা এক নজর দেখে বলে, তাহলে বছর দুয়েকের মধ্যে আমার একটা ফোন আপনি আশা করতে পারেন।

আসাদউল্লাহর যাওয়ার কোনো তাড়া ছিলো না মনে হয়। বলে, আপনি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামটা দেখেছেন লক্ষ্য করে?

বিজু সামান্য লজ্জা পায়, তার অমনোযোগ ভদ্রলোক ঠিক ধরে ফেলেছে। কার্ডটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে, এ কে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। অর্থাৎ আসাদুল্লাহ কবির ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। ভদ্রলোক কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। বিজু জিজ্ঞেস করে, কী ধরনের কাজ করেন আপনারা?

আসাদুল্লাহ বলে, আমিও আপনার মতো ইঞ্জিনিয়ার, তবে মেকানিক্যালের। কয়েক বছর চাকরি করার পর ব্যবসা শুরু করি। প্রথমদিকে মেকানিক্যাল ড্রাফটিং-এর কাজ বেশি করতাম। এখন ইলেকট্রিক্যাল, এনভায়রনমেনটাল, ইলেকট্রনিকস-এর ডিজাইন, ড্রাফটিং, প্রসেস অটোমশেন ডিজাইন সব ধরনের কাজ করি। একটা মেশিন শপ আছে, পার্টস-অ্যাসেম্বলি-প্রোটোটাইপ বানাই।

কফিতে আরেক চুমুক দিয়ে আসাদুল্লাহ বলে, আপনাকে কার্ড দিয়েছি দু'বছর পর ফোন করার জন্যে নয়। আপনার ফোন চাই দিন দুয়েকের মধ্যে। বসে আলাপ করে দেখা যায়, আমাকে আপনি পছন্দ করছেন কিনা বা আপনাকে আমার কোনো কাজে লাগবে কি না।

এক সপ্তাহের মধ্যে বিজু এ কে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ কাজ শুরু করেছিলো। পুরোপুরি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চাকরি নয়, তবু তার লাইনের কাছাকাছি কাজ। তিনশো ডিগ্রী তাপের গ্রিলের পাশে দাঁড়িয়ে বারগার বানানো বা দুই পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে গ্যাস বিক্রির পয়সা গোনার চেয়ে ভালো।

চাকরিতে ঢুকে বিজুর মনে হয়, এক ধরনের ফাঁদে সে পা দিয়ে ফেলেছে। এই যে একটা লাইনে ওঠার ব্যাপার ঘটলো, চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করার সুযোগ পাওয়া গেলো, এরপরে আর হয়তো পিছু হটা নেই। এই নেশা তোমাকে সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকবে। তখন দেশে ফিরে যাওয়া কি আর ততো জরুরি মনে হবে? এই ফাঁদে তার পড়া চলবে না, কিছুতেই না। পড়লে নিজের কাছে ছোটো হয়ে থাকবে সে। আত্মবিশ্বাসের অহংকার তাহলে কোথায় থাকবে তার?

রানু খুশি। আত্মীয়-পরিজনবিহীন এই শহরে দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, সামান্য ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেছে। তবু শেষ পর্যন্ত পরস্পরকে ছাড়া অবলম্বন আর কোথায় তাদের! এখন দিনের শেষে একত্রে বসে চা খাওয়ার সময় পাওয়া যায়, টিভির সামনে বসা হয়, চাই কি রাতের শো-তে সিনেমা দেখে আসা যায়। দরকারি-অদরকারি, সাংসারিক ও সুইট নাথিংস বলাবলি।

তবু অদূর বা সুদূর ভবিষ্যত নিয়ে জরুরি কথাগুলো উহ্য থেকে যায়। আমেরিকায় স্থিত হওয়া-না-হওয়া বিষয়ে তাদের ইচ্ছে যে বিপরীতমুখী, তা দুজনেরই কমবেশি জানা। বাচ্চা-

টাচ্চা নেওয়ার বিষয়ও এই মুহূর্তে খুব স্পর্শকাতর। ঢাকায় সেই দুঃখরাতের পর তারা কেউ এই নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। দু'জনে খুব যত্ন করে একটা দেয়াল তুলে রেখে তার পরিচর্যা করে যাচ্ছিলো। 'আই ফীল ইউ আর স্লিপিং আওয়ে, আই অ্যাম লুজিং ইউ।'

আসাদুল্লাহ একদিন লাঞ্চে নিয়ে যায় বিজুকে। জিজ্ঞেস করে, কাজ কেমন লাগছে?

বয়সের বিস্তর তফাৎ সত্ত্বেও আসাদুল্লাহ আপনি থেকে তুমিতে নামেনি। বিজু বলে, যা করছিলাম তার তুলনায় তো ভালোই।

একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলি। আমি জানি, এই কাজ আপনার খুব বেশিদিন ভালো লাগবে না। আমিও চাই না আপনাকে চিরদিন আটকে রাখতে। কোথাও আপনার শুরু করা দরকার ছিলো, আমি সেখানে একটু হয়তো সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। ক্যারিয়ারের জন্যে আপনার এখানে কিছু কোর্স নিয়ে নেওয়া উচিত। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমটা নিলে ভালো করবেন বলে আমার মনে হয়। খোঁজখবর নিয়ে ভর্তি হয়ে যান, অফিসের পরে সন্ধ্যায়ও ক্লাস নিতে পারবেন।

কিন্তু আমি এ দেশে থাকতে চাই না, আপনাকে বোধহয় বলেছিলাম।

আসাদুল্লাহ হাত তুলে বিজুকে থামিয়ে দিয়ে বলে, না চাইলে থাকবেন না। কিন্তু যা শিখবেন পৃথিবীর যে কোনোখানে আপনার কাজে লাগবে। আপনার ক্যারিয়ারের কথা ভেবে বলছি, নতুন একটা বিদ্যা বা স্কিল আয়ত্ত্ব করার সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে নেই।

অস্বীকার করার বা অসম্মত হওয়ার কারণ খুঁজে পায়নি বিজু। সে ভর্তি হয়েছিলো যখন রানুর এম এস শেষ হতে আর মাসকয়েক বাকি। তাতে ক্ষতি কিছু নেই, দুটো বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে। শেষ হলে রানুর সঙ্গে দেশে ফেরার ফয়সালা করে নিতে হবে।

পাশ করার পরপরই রানু চাকরি পেয়ে যায়। সেই সময় আর্কিটেক্টদের চাকরির বাজার মন্দা, চারদিকে ছাঁটাই হচ্ছে। কয়েকজন বাঙালি আর্কিটেক্টের বেকার হয়ে যাওয়ার খবরও শোনা গিয়েছিলো। সেই বাজারে কোনোরকমের অভিজ্ঞতা ছাড়া রানুর চাকরি হওয়া অভাবিত বটে। বিজুর ধারণা ছিলো, চাকরির বাজারের মন্দা অবস্থাটাকে রানুর সঙ্গে দেশে ফেরার দরকষাকষির সময় ব্যবহার করা যাবে – চাকরি না পেলে এখানে থাকা যাবে কী করে! তা বোধহয় আর হলো না।

বিজুর কোর্স শেষ হওয়ার ঠিক আগে এক রাতে রানু জানায়, ডাক্তার কনফার্ম করেছে।

একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো বিজুর। সচকিত হয়ে ওঠে সে, কী কনফার্ম করেছে? রানু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলো, তা-ও জানা ছিলো না তার। খুবই আচমকা এবং কোনো প্রসঙ্গ ছাড়া কথা। বিজুর মনে হয়, সে যা ভাবছে তাই কি? তবু কিছু না বলে অপেক্ষা করে।

সাড়া না পেয়ে রানু বলে, তুমি কি ঘুমিয়ে গেলে?

না, বলো। শুনছি।

ডাক্তার আজ রিপোর্ট দিয়েছে, দু'মাস চলছে।

এই খবরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া খুশি হওয়া। বিজু খুশি কি না, বুঝতে পারে না। এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া ছিলো এতোদিন, আজ হঠাৎ ঢাকনা উঠে যাওয়ায় সে খানিক অপ্রস্তুত বোধ করে। মুখে কোনো কথা আসে না।

প্রথমবার রানু তার আমেরিকাযাত্রা ঠেকানোর জন্যে বিজুর চেষ্টা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলো। এবার কি বিজুকে এই দেশে আটকে রাখার ষড়যন্ত্র রানুর? অভিযোগটা এখন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না!

রানু অন্ধকারে হাতড়ে বিজুর হাত ধরে, তুমি কিছু বলছো না যে!

কী বলবো বলো তো! অনেক বছর ধরে যে কথা মনে না করার চেষ্টা করে আসছি, তোমার কথায় তা মনে পড়ে যাচ্ছে।

তুমি আমাকে এখনো ক্ষমা করোনি, তাই না?

আমি ক্ষমা করার কে রানু? সবচেয়ে বড়ো কথা তুমি নিজেকে ক্ষমা করতে পেরেছো কিনা। আমার কথা যদি বলো, তাহলে বলি ওই ঘটনার পর আমাদের জীবন ওলটপালট হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তা যায়নি, এখনো আমরা এক ছাদের নিচে বাস করি। এক বিছানায় ঘুমাই।

বিজু একটু থামে। রানু চুপ করে শুনছে। বিজু মৃদু স্বরে বলে, ওই বিষয়ে কোনোদিন কারো কাছে একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি। করলে নিজেকে লজ্জিত হতে হতো, তোমাকে ছোটো করা হতো। কিন্তু ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই ঘটনা ছিলো আমার জন্যে এক ধরনের রূঢ় জাগরণ।

ফুলটুস জন্মানোর সময় বিজু লেবার রুমে ছিলো রানুর সঙ্গে। হাসপাতালের ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি লেবার রুমে যেতে চাও?

এদেশে সাধারণত কেউ না করে না। রানুও চায় বিজু তার সঙ্গে যাক। বিজু সাহস করে হ্যাঁ বললেও মনে মনে যে একটু দ্বিধা বা ভয় ছিলো না, তা নয়। বাচ্চা জন্মানোর বিষয়ে যা জানা ছিলো, তা-ই যথেষ্ট ভয়ংকর। যা কিছু যন্ত্রণা সব যাবে রানুর ওপর দিয়ে, তার ভূমিকা শুধু দেখা, সঙ্গে থেকে রানুকে সাহস দেওয়া। তবু মনে হয়, সেই যন্ত্রণা অবলোকনের যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে তো?

পরদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রানু লেবার রুমে কেমন লাগলো জিজ্ঞেস করে। বিজু বলে, বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কিন্তু লেবার রুমে তোমার সঙ্গে না গেলে একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। মেয়েদের ওপর আমার শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হলো। সব পুরুষমানুষের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমি জানি এই অমানুষিক যন্ত্রণা আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হতো না। এই কষ্টের কথা জেনেও মেয়েরা কীভাবে আবার বাচ্চা নিতে চায়, আমার বুদ্ধিতে কোনোদিন কুলাবে না।

মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে ছিলো রানু। পরিতৃপ্ত দেখায় তাকে। মাতৃত্বের অহংকার কথাটা শোনা ছিলো, এবার দেখা হলো বিজুর।

১৫

আগামীকাল ফুলটুসের স্কুলে গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে। কালই তো! সেদিন স্কুলের নিউজলেটারে দেখেছে, মনে পড়ছে বিজুর।

দিনের শেষ সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয়। রানুকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারে, এমন দাবি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিয়ের আগে-পরে মিলিয়ে পনেরো-ষোলো বছর, একজন মানুষকে জানার জন্যে কি যথেষ্ট সময় নয়? হয়তো যথেষ্ট, হয়তো নয়। কিন্তু নয় কেন? এর মধ্যে বারো বছর একই ছাদের নিচে বসবাস করেছে, এক বিছানা ভাগাভাগি করেছে।

শারীরিক নৈকট্য ও সহাবস্থান হয়তো কিছু সাহায্য করে, কিন্তু রানুর রহস্যময়তা ঠিক ঠিক বোঝা আজও হলো না! এই যে আজ এয়ারপোর্ট থেকে ঘরে ফিরে প্রথম পাওয়া উপেক্ষা, ঠিক তার বিপরীতে বিজুর পছন্দমতো পোশাক ও সজ্জা। স্যুভেনির পেয়ে খুশি হওয়া, তার উল্টোদিকে খাবার গরম করা নিয়ে তীক্ষ্ণ বাক্য। মেলে না যে!

টেবিলে বিজুর পছন্দের খাবার সাজিয়ে পাশে এসে বসার পর মনে হতে পারে দিনের শেষে একটি মধুর সমাপ্তি অপেক্ষা করে আছে। অথচ এখন সে আচমকা ঘুমিয়ে পড়লো, এর ব্যাখ্যা কোথায়? হয়তো ইচ্ছের সঙ্গে মিলিয়ে ঘটনা সবসময় ঘটে না, ঘটানো যায়ও না। কে জানে, খাবার টেবিলে রানুর বসা নিয়ে বিজুর অস্বস্তি কোনো ভুলে যাওয়া অন্ধকার ঘরে হয়তো অকস্মাৎ আলো ফেলে থাকবে।

উঠে পড়ে বিজু, ভেতরে এসে প্যাটিওর দরজা বন্ধ করে। শোয়ার ঘরে যাওয়ার আগে ফুলটুসের ঘরে ঢোকে। নাইট লাইটের অল্প আলোয় দেখা যায়, উপুড় হয়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে মেয়ে। নতুন পাওয়া বারবি এক হাতে জড়িয়ে ধরা। চেয়ারের ওপর কাল স্কুলে যাওয়ার সব কাপড়চোপড়। মেয়ে নিজে ঘুমানোর আগে কোনোসময় এই কাজটা করে রাখে। সকালে উঠে তাড়াহুড়োর মধ্যে কী পরবো, কী সঙ্গে নেবো এই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। এই বয়সেই এইসব শৃঙ্খলা বাচ্চাদের শিখে রাখা দরকার, সারাজীবন কাজে লাগবে।

টেবিলের পাশে স্কুলের ব্যাকপ্যাক খুলে টেক-হোম ফোল্ডার বের করে বিজু। ফোল্ডারে স্কুলের প্রতিদিনের এবং আসন্ন কার্যকমের বিবরণ, ক্যালেন্ডারে মাসের বিশেষ দিনগুলো হাইলাইট করা। অভিভাবকরা আগাম জেনে যায়, স্কুলে কবে কী হচ্ছে। এ ঘরে আলো জ্বাললে ফুলটুসের ঘুম ভাঙবে না ঠিকই, কিন্তু চোখে আলো পড়লে চোখমুখ কুঁচকে পাশ ফিরবে মেয়ে।

ফোল্ডার হাতে নিয়ে বসার ঘরে আসে বিজু। হ্যাঁ, কাল গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে। ছেলেমেয়েরা তাদের দাদা-দাদী বা নানা-নানীকে কাল স্কুলে নিয়ে যেতে পারবে সঙ্গে করে।

ক্লাসে তারা বাচ্চাদের গল্প শোনাবে, একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে। বাচ্চাদের জন্যে খুব মজার হবে, বিজু আন্দাজ করতে পারে। আচ্ছা, বাংলাদেশে বাচ্চাদের স্কুলগুলোতে এরকম নিয়ম নেই কেন? দেশে বাচ্চারা এদের তুলনায় অনেক বেশি দাদা-দাদী বা নানা-নানীর ন্যাওটা হয়।

ফুলটুস তার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টদের কতোটুকু চেনে? সামান্য সময়ের যা দেখা-সাক্ষাত হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। নানীর সঙ্গে ছাড়া ঘুমাবো না জাতের আবদার করার মতো ঘনিষ্ঠতা কখনো তৈরি হয়নি!

ফুলটুস জিজ্ঞেস করেছিলো, বাবা, গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে-তে আমার সঙ্গে কে যাবে? আমার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টরা কেউ এখানে থাকে না কেন?

কী উত্তর দেয় বিজু? কীভাবে বললে মেয়েকে বোঝানো যাবে তার দাদা-দাদী বা নানা-নানী কেন এখানে থাকে না। জানে, বোঝানো সম্ভব নয়। তাই হালকা করে বলেছিলো, তারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, সেইজন্যে মনে হয় এখনে থাকতে চায় না।

ফুলটুস মানতে রাজি নয়। বলে, আমার ক্লাসের ম্যানুয়েল-এর গ্র্যান্ডমা স্প্যানিশ ছাড়া কিচ্ছু জানে না, বলতেও পারে না। সে ম্যানুয়েলদের বাসায় থাকে!

বিজু মনে মনে ভাবে, ম্যানুয়েল ভাগ্যবান। তোর বাবা-মা এখানে স্বেচ্ছা-উদ্বাস্তুর বেশি কিছু নয়, ফুলটুস। তারা তাদের শেকড়ছেঁড়া একজোড়া মানুষ। এখানে তাদের বাবা নেই, মা নেই, ভাইবোন নেই। তারাও কারো পুত্রকন্যা, আত্মীয়-পরিজন। কিন্তু তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় এই দেশে।

এখানে শেকড় গেড়ে স্থিত হবে কি না, তা-ও ঠিক হয়নি এখনো। এই পরিচয়হীনতার বেদনা, বিচ্ছিন্নতার বিষাদ তোকে কেন, তোর মাকেও কি ঠিক বোঝানো যাবে? সে কি এইসব বিপন্নতা টের পায়? ভাবে?

ফুলটুসকে বলে, আচ্ছা আমি বুড়োর মেকাপ নিয়ে তোর গ্র্যান্ডপা সেজে গেলে হয়?

সেটা তো নকল হয়ে যাবে বাবা। সত্যিকারের তো নয়।

বিজু জানে, এ দেশে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীর ছেলেমেয়েদের কাছে বাবা-মাকে অনেকগুলো ভুমিকায় অভিনয় করতে হয় একই সঙ্গে। বাবা-মা-ভাই-বোন ছাড়া আর কোনো নিকটজনের কোনো অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই।

মামা, চাচা, ফুপু, খালা এই ধরনের কিছু সম্পর্কের ধারণা আছে তাদের, জানে না সেগুলো সত্যিকারের কি না, তারা ঠিক কারা। মাঝেমধ্যে ছবিতে হয়তো দেখে, দেশে গেলে দেখাশোনা হয় কিছুদিনের জন্যে। তাতে কি কিছু স্পষ্ট হয়? সম্পর্ক, আত্মীয়তা তৈরি হয়?

খালা বা ফুপুর কাছে যে স্নেহচুম্বনটি তাদের পাওনা, সেটি আসে মায়ের কাছ থেকে। অনুপস্থিত দাদীর হয়ে গল্প বলার দায়িত্ব হয়তো বাবার। আসলের স্বাদ-গন্ধ-বচন তবু অধরা থেকে যায়।

তুমি দাদু সাজতে পারো, কিন্তু তুমি তো দাদু নও!

ফুলটুসের ঘরে ফিরে বিজু ফোল্ডার ঢুকিয়ে রাখে ব্যাকপ্যাকে। বিছানার পাশে গিয়ে অভ্যাসবশে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দেয়। একটু নড়ে ওঠে ফুলটুস, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে। বোঝা যায় না। ভাবলে খুব অবাস্তব বোধ হয়, পৃথিবীতে বাবা-মা ছাড়া এই শিশুটি কী নিঃসহায়, নিরবলম্ব।

হঠাৎ কখনো কখনো খুব অদ্ভুত ভাবনা আসে। কোনো একটা দুর্ঘটনায় সে আর রানু যদি মারা যায়, এমন যে ঘটে না তা নয়, ঘটতেই পারে, এই মেয়েটির তখন কী হবে? কার কাছে যাবে সে? যদিও জন্মসূত্রে এই তার দেশ, তবু তার আপনজন কেউ থাকবে না। কার অবলম্বন পাবে সে? কীসের আশ্রয়, কীসের নিরাপত্তা সে রেখে যাচ্ছে মেয়ের জন্যে?

ফুলটুস যখন একমনে টিভিতে কার্টুন দেখে, মাঝে মাঝে বিজু পাশে বসে মেয়ের মুখে অপলক তাকিয়ে থাকে। মেয়ের বিস্ময়ভরা চোখ দেখে, কপাল দেখে, ভুরু-ঠোঁট-চিবুক দেখে আর ভাবে, এই শিশুটির বাবা সে! এই অপরূপ বিস্ময়বোধ যে যায়ই না!

ঘুমাতে যাওয়া উচিত এখন। ঘুম পায়নি, তবু যেতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঝকঝকে নতুন একটি দিন শুরু হলেও পুরনো আর চেনা সব দুরন্ত ব্যস্ততা নিয়ে দৌড় শুরু হবে আবার। এ দেশে যাকে ইঁদুর-দৌড় বলা হয়, তার এক অনিচ্ছুক দৌড়বিদ ইঁদুর সে। তবু দৌড়ে নেমে পিছিয়ে যেতে, থেমে যেতে কে চায়! অন্তর্গত প্রবৃত্তি ছুটিয়ে নেয়, তাড়া দয়ে ক্রমাগত – যতোক্ষণ দৌড়ের মধ্যে আছি, সামনের দিকে এগোতে হয়।

গোসল সেরে ঘুমপোশাক পরে নিয়েছিলো বিজু। শোয়ার ঘরে দরজার কাছে দাঁড়ায়। এ ঘর আর ফুলটুসের ঘরের মাঝখানের প্যাসেজে আলো সারারাত জ্বলে। রাতে হঠাৎ কখনো ঘুম ভেঙে গেলে মেয়ে নিজের বিছানা ছেড়ে ধুপধাপ করে উঠে এসে বাবা-মার মাঝখানে ঢুকে পড়ে। প্যাসেজের আলো জ্বলে ওরই জন্যে, যাতে ঘুমচোখে অন্ধকারে হোঁচট না খায়।

ঘুম পাতলা হলেও ঘুমিয়ে গেলে রানুর আর কিছু হুঁশ থাকে না, বিচিত্র সব ভঙ্গিতে বিছানাময় ঘুরে ঘুরে ঘুমায় সে। প্যাসেজের আলোয় বিজু বিছানায় রানুর অবস্থান দেখে। কতোবার দেখেছে বিজুর জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার দখল নিয়ে ঘুমাচ্ছে রানু। আজ এখনো তাকে নিজের জায়গায় আছে দেখে হঠাৎ সন্দেহ হয়, আদৌ কি ঘুমিয়েছে সে?

খুব সাবধানে নিঃশব্দে বিছানায় ওঠে বিজু, বালিশে মাথা এলিয়ে দেয়। পা দুটো বিছানায় তুলে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। রানুর কোনো নড়াচড়া নেই, গভীর নিস্তব্ধতার ভেতরে তার নিয়মিত নিশ্বাসের মৃদু শব্দ পাওয়া যায়। সন্ধ্যারাতের সেই সুগন্ধ স্মৃতির মতো উঠে আসছে তার শরীর থেকে। ডানদিকে কাৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে রানু, মুখ বিজুর দিকে।

অন্ধকার ঘরে বিজুর ঘুমাতে ভালো লাগে না। রানু ঘুমানোর সময় আলো একেবারে সহ্য করতে পারে না, তার চোখে লাগে। কতোরকম বিপরীতমুখী পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার যে আছে! সব দাম্পত্যে থাকে? গ্রীষ্মকালে বাইরে যখন ঠা ঠা রোদে চরাচর পুড়ে যাচ্ছে, তাপ ফারেনহাইট একশোতে, রানু তখন এয়ারকন্ডিশনারের অটোসেটিং দিয়ে রাখে পঁচাশিতে। পঁচাত্তর হলে বিজুর ঠিক হয়, তাহলে আবার রানুর শীত করে। শীতকালেও একই অবস্থা, হীটার পঁচাত্তরে দিলেও রানুর গরম লাগে।

একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলো বিজু, জানো এইসব কারণে বিয়ের আগে লিভ-টুগেদার খুব জরুরি। চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলে না ঠিকমতো বোঝা যায় না, আমার সঙ্গে তোমার পোষাবে কি না। টেম্পারেচার টলারেন্স লেভেল মেলানোটাও খুব জরুরি সংসার করার জন্যে। একসঙ্গে বাস করলে ঠিক বোঝা যায়, কতোটুকু মিলছে আর কতোটা মিলছে না।

বিশুদ্ধ ঠাট্টা। সে নিজে একটি জুটির কথা জানে যারা চোদ্দো বছর একসঙ্গে বসবাসের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে দু'জনে কোর্টে গিয়েছিলো বিচ্ছেদের আবেদন হাতে নিয়ে। রানুর কাছে তা ঠাট্টা মনে হয়নি। গম্ভীর মুখে বলেছিলো, আমাকে বিয়ে করে এতো দুঃখ তোমার!

বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে প্যাসেজের আলো ঘরে কিছু ঢুকে পড়ে গোপন অনুপ্রবেশকারীর মতো। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে বেশি সময় লাগে না। বিজু মুখ ফিরিয়ে দেখে রানুকে। তার গায়ের ওপর থেকে কম্বল নেমে গেছে হাঁটুর কাছে। গোসলে ঢোকার আগে কম্বল পায়ের কাছে গোটানো দেখেছিলো মনে পড়ে। রানু পরে টেনে নিয়েছে।

পরনের শাড়ি সামান্য আলগা হয়ে একপাশে বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। ভারি লোভ জাগানো বুক রানুর। তার নিচে থেকে কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত, প্রায় মেদহীন। শাড়ি নাভির সামান্য নিচে। দেসারুতে বিজুর আগ্রহে ওভাবে শাড়ি পরতে শুরু করেছিলো রানু। 'কালিম্পং-এর কুয়াশায় চাঁদের মতো মনীষার নাভি...' এক কবির লেখা গদ্য থেকে উদ্ধৃত করে রানুকে শুনিয়েছিলো বিজু। সে কতোদিন আগের কথা। অনেকদিন?

বিজু অনুভব করে তার শরীর জেগে উঠছে। এই শরীর কোনো বিষাদ, অভিমানের ধার ধারে না। গত কয়েকদিনের মন কষাকষির মেঘ সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত রানু নিজে দিচ্ছিলো

সন্ধ্যায়, আবার আচমকা সে নিজেকে প্রত্যাহারও করে নিয়েছে। তারপরেও বিজু কেমন করে হাত বাড়ায়? হয় না, পারা যায় না। তার অহম, অভিমান তাকে বাধা দেয়। রানুকে স্পর্শ করার, তাকে জাগানোর অবিবেচক, লোভী আকাঙ্ক্ষাকে পাশ কাটিয়ে সে নিজেকে সংহত করার চেষ্টা করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার স্থির বিশ্বাস হয় রানু জেগে আছে, ঘুমায়নি। ঘুমের ভেতরে সে অনেক নড়াচড়া করে, এমন পরিপাটি শোয়া রানুর নয়। কিঞ্চিৎ অগোছালো মনে হলেও তা সাজানো বলে সন্দেহ করা চলে। বিছানায় পাশাপাশি শোয়া দু'জন মানুষ স্পর্শ করার দূরত্বে। এই সামান্য দূরত্বও দুরূহভাবে অনতিক্রম্য!

বিজু চোখ বন্ধ করে। রানু পারলে সে-ও নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে।

১৬

বাচ্চা কার মতো দেখতে হয়েছে? মেয়েকে দেখে কেউ বলে, ঠিক মা-র মুখ হুবহু বসানো। কিছু পরে কেউ বলে, বাবার মতো। বিজু কৌতুক বোধ করে। বিরক্তিও। সদ্য জন্মানো বাচ্চার মুখ দেখে সে কার মতো দেখতে এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর, মন্তব্যও তেমন অর্বাচীন। হাসপাতালের নার্সারিতে উঁকি দিয়ে দেখে, সারি সারি শিশু আলাদা ক্রিবে শোয়ানো, নার্সরা তাদের পরিচর্যা করছে। এর মধ্যে তার মেয়েও আছে। শুধু গায়ের রং ছাড়া সবগুলো শিশু দেখতে হুবহু একই রকম। না বলে দিলে বিজু চিনতেও পারবে না কোনটা তার মেয়ে।

এক ভদ্রলোকের কথা জানে বিজু। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর ছেলে কার মতো দেখতে শুনতে শুনতে ভদ্রলোক অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন, পাশের বাড়ির লোকটার মতো!

রানু অফিসে যেতে শুরু করেছে। ফুলটুসের এখন দু'মাস। বিজুর ইচ্ছে ছিলো, রানু কাজে ফেরার আগে আরো কিছুদিন মেয়ের সঙ্গে থাকুক। মা ছাড়া আর কাউকে সে এখনো চেনে না, আর কে বুঝবে এখন তাকে? কোন সুদূর থেকে মর্ত্যে নেমে আসা দেবশিশুটিকে এক্ষুণি ডে কেয়ারে পাঠাতে মন সরে?

বিজু বলে, ও কি এই বয়সে ডে কেয়ারে থাকতে পারবে?

কেন পারবে না? এখন থেকে বরং অভ্যাস করানো দরকার।

যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে বিজু, ওখানে বাচ্চাকাচ্চাদের অনেক ছোঁয়াচে অসুখবিসুখ হয়। ডে কেয়ারের বাচ্চারা নাকি বেশি অসুস্থ থাকে শুনেছি।

রানু বলে, এ দেশে লক্ষ লক্ষ বাচ্চা এই বয়সে ডে কেয়ারে যাচ্ছে না? যাচ্ছে তো। অসুখ-টসুখ এমনিতেও হতে পারে।

তা পারে, বিজু জানে। এও জানে, বাচ্চা আরেকটু বড়ো হলে শরীরের প্রতিরোধ শক্তিও কিছু বাড়ে। তখন ডে কেয়ারে সমস্যা কম হয়। বিজু মেয়ের ব্যাপারে বোধহয় বেশি সতর্ক, কিছুটা প্রাচীনপন্থীও। মায়ের কাছে শিশুর যত্ন সঠিক হয় বলে এখনো তার বিশ্বাস। ডে কেয়ারে ওরা যা করবে তা গণপরিচর্যা।

সে বলে, রানু অন্যরা যা করে আমাদেরও তাই করতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

তর্কে রানু পিছু হটেছে কবে? বলে, তুমি যা চাও তা-ই বা আমাকে মানতে হবে কেন?

ঠিক, বিজুর চাওয়া বা না-চাওয়ায় কী এসে যায়? রানু কি তার নিজের ভালোমন্দ বোঝে না! তা বোঝে, খুব বোঝে। সংসার বা দাম্পত্য যে যৌথ ব্যাপার, সে বিষয়ে সে কী মনে

করে? 'হোয়াইল ইউ সী ইট ইয়োর ওয়ে, দেয়ার'স আ চ্যান্স দ্যাট উই মে ফল অ্যাপার্ট বিফোর টু লং...'

রানু সম্ভবত সবসময়ই জানে, সে কী চায় এবং তা অর্জনের জন্যে সঠিক করণীয় কাজগুলি যথাসময়ে করবে। বিজু জানেনি, কিন্তু তার হিসেব কষে ঠিক করা ছিলো কখন সে কাজে ফিরে যাবে। হয়তো তা মাথায় ছিলো বলে মেয়েকে বুকের দুধেও অভ্যস্ত করেনি। পাম্প করে বোতল বোতল দুধ ফেলে দিয়েছে, বাছুরকে ঠেলে সরিয়ে মানুষ যেভাবে গরুর দুধ দুয়ে নেয়। মেয়ে খাচ্ছে বাজারের বেবিফুড।

ম্যাটারনিটি লীভ শেষ হওয়ার পরে বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্যে লীভ অব অ্যাবসেন্স নেওয়া যায়, তা অনির্দিষ্টকালও হতে পারে। রানু নিজে একদিন বলেছিলো, তার অফিসে এক মহিলা লীভ অব অ্যাবসেন্স থেকে কাজে ফিরে এলো তিন বছর পর। অথচ নিজের বাচ্চা হওয়ার পর এই সুবিধা নেওয়ার কথা রানু মনে রাখেনি।

অতো দীর্ঘ সময় রানু কাজে না ফিরে বাচ্চার সঙ্গে থাকবে, তা আশা করেনি বিজু। তবে এতো তাড়াতাড়ি ফেরারও দরকার ছিলো না। বাৎসরিক ছুটি অবশ্য খরচ করে ফেলা উচিত হবে না, কখন কী দরকারে লেগে যায়! বাচ্চার অসুখ-বিসুখের মতো জরুরি পরিস্থিতি যখন-তখন হতে পারে। লীভ অব অ্যাবসেন্স নিলে চাকরি হারানোর ভয় নেই, আইন তা রক্ষা করবে। শুধু বেতন পাওয়া যাবে না। তাতে সমস্যা কিছু ছিলো না। মাসকয়েক আগে বিজু এ কে সার্ভিসেস ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকরি শুরু করেছে, তাতেই দিব্যি চলে যাবে।

রানুর কথা, শুধু সংসার চললেই হলো? ভবিষ্যৎ আছে! এখন মেয়ের কথা ভাবতে হবে।

বিজু বলে, ঠিক তা-ই আমি বলছি, মেয়ের কারণেই কিছুদিন পরে কাজে ফিরতে পারো।

আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি।

আমি তোমাকে চিরদিন ঘরে থাকতে বলিনি রানু, কখনো চাইনি। তোমার ক্যারিয়ার তৈরি হোক, তাই-ই চেয়েছি বরাবর।

তুমি আমাকে আমেরিকা আসতে দিতে চাওনি।

এসেছো তো।

কীভাবে আসতে হয়েছে তুমি জানো।

বিজু চুপ করে যায়। সে জানে। তার চেয়ে বেশি আর জানে কে! মনে মনে বলে, তার জন্যে যে মূল্য দিয়েছো, এই অর্জনের জন্যে তা দরকার ছিলো কি না তাও ভাবা দরকার। কিন্তু সেসব সে আর ভাবতে ইচ্ছুক নয়। তাতাই-টুপুর আর হবে না। ফুলটুস আছে!

১৭

ওই লোকটা কে? আগে কোনোদিন দেখেনি। বসে থাকলেও বোঝা যায় লোকটা যথেষ্ট দীর্ঘকায়, তার মায়াবী চোখ দুটি প্রথমে চোখে পড়ে। সোফায় পা তুলে বসে হাত নেড়ে কিছু একটা বলছে সে। খুব হাসির কথা হবে, রানু উল্টোদিকের সোফায় বসে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে।

এখনো সেই কলাপাতা সবুজ শাড়ি তার পরণে। মাতাল হাওয়ার মতো সুগন্ধি কি এখনো তার শরীরে লেগে আছে? হাসি থামিয়ে রানু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে লোকটার সামনে দাঁড়ায়। ঝুঁকে পড়ে তার ঠোঁট একবার চুম্বন করে। লোকটা হাত বাড়ায়, রানু তার আগেই সরে গেছে।

বিজু স্পষ্ট বুঝতে পারে সে স্বপ্ন দেখছে, তবু সহ্য করা হয় না। পারলে রিমোট কন্ট্রোলে স্টপ চেপে দিয়ে দৃশ্যটাকে অন্তর্হিত করে সে জেগে ওঠে। পারা যায় না। ছবি এখনো সচল। এখন লোকটা আর নেই। দৃশ্যপট বদলে গেছে।

রানু অনেক উঁচু একটা বিল্ডিং-এর জানালায় দাঁড়িয়ে। পনেরো তলা? বিশও হতে পারে। রানু নিচে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে। ঝুঁকে পড়েছে সে, আরো বিপজ্জনকভাবে সামনে ঝুঁকে পড়ছে। তার শরীর হঠাৎ পাক খেয়ে জানালার বাইরে ছিটকে পড়ে। কিন্তু রানু কোথায়? তাকে দেখা যায় না। এখন বিজু নিজে পড়ে যাচ্ছে অসীম শূন্যতার ভেতেরে – বাড়িঘর, গাছপালা, মানুষজন কিছুই দেখা যায় না।

এবারে কোনো চেষ্টা ছাড়াই ঘুম ভেঙে যায় বিজুর। শূন্য থেকে অসীম শূন্যে পড়ে ভয় পায়নি সে, নাটকীয় ভঙ্গিতে বিছানায় উঠেও বসেনি। জানে, স্বপ্ন দেখছিলো এতোক্ষণ। পূর্ণচোখে অন্ধকার ঘরে তাকিয়ে মনে পড়ে, স্বপ্নের একটা সংলাপও সে শুনতে পায়নি। শুধু ছবি দেখছিলো, যেন রিমোটে কেউ মিউট চেপে দিয়েছিলো।

পাশে তাকিয়ে দেখে, রানু গুটিসুটি মেরে চিংড়ি মাছের ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। মাথা আর বালিশ আলাদা জায়গায়। রানুর ঘুমটাকে এখন সত্যিকারের ঘুম মনে হয়। অ্যালার্ম ঘড়িতে চারটা দশ। আরো ঘণ্টা দুই সময় আছে। চোখ বন্ধ করলেও স্বপ্নের দৃশ্যগুলো টুকরো টুকরো হয়ে চোখের সামনে উঠে আসে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা আছে কোনো? বিজু জানে না, ভাবেও না। তবু মনে হয়, স্বপ্নটা সে কেন দেখলো? রানুকে কি কোনো কারণে সে সন্দেহ করতে শুরু করেছে? তেমন কোনোকিছু কখনো ঘটেনি, মনেও হয়নি। নিজেদের মধ্যে বোঝা-না-বোঝার মামলা আছে, দূরত্ব আছে। কোনো তৃতীয় পক্ষের ছায়া সেখানে নেই। তবু একে কি কোনো অনিশ্চয়তার বোধ

বলে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবল আত্মবিশ্বাসী পুরুষও হয়তো কিছু ভঙ্গুর হয়। 'ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে...।'

অফিসের জন্যে তৈরি হতে হতে গতরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে বিজুর। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো আর অতো উজ্জ্বল নেই, ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে। একটু হাসি পায়, সামান্য বিষণ্নতাও কি নেই? তা-ও আছে। স্বপ্নটা খুব অদ্ভুত, কিন্তু ওই লোকটা কে? কোথা থেকে এলো সে? পরিচয় কী তার?

ফুলটুস স্কুলে যাওয়ার পোশাক পরে ব্যাকপ্যাক নিয়ে তৈরি, এখন বসে বসে কার্টুনের প্রাতঃকালীন ডোজ গিলছে। সকালে সে একদম কিছু মুখে তুলতে চায় না। রানু জোর করে অর্ধেকটা ডিমসেদ্ধ, কোনোদিন দুধ-সিরিয়াল জাতীয় কিছু একটা খাইয়ে দেয়।

রানু মেয়েকে খাইয়ে এসে অফিসে যাওয়ার পোশাক পরে ফেলেছে, এখন ড্রেসারের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন সারছে। প্যান্টের বেল্ট লাগাতে লাগাতে বিজু তাকিয়ে দেখে, আয়নায় রানুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সামান্য হাসে রানু। বলে, কাল রাতে কখন ঘুমাতে এসেছিলে?

বলতে ইচ্ছে করে, তুমি যে জেগে ছিলে, আমি জানি রানু। বলে না। তার পরিবর্তে সহজ গলায় বলে, খুব বেশি দেরি করিনি, তুমি দেখলাম বেঘোরে ঘুমাচ্ছিলে।

হ্যাঁ, কেন যেন খুব খারাপ লাগছিলো। তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম।

আমি অনেকক্ষণ জানতেই পারিনি তুমি শুয়ে পড়েছো।

রানু হঠাৎ এগিয়ে এসে বিজুকে অবাক করে দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট বোলায়। সত্যিকারের চুমু নয়, অনেকটা প্রতীকী ধরনের। নাহলে এই তাড়াহুড়োর সময়ে আবার নতুন করে লিপস্টিক মাখতে হবে। স্বপ্নে দেখা চুম্বনদৃশ্যটি মনে পড়ে বিজুর। কিন্তু ওই লোকটা কে? রানুকে বলবে নাকি স্বপ্নের কথা? নাঃ, বলা যায় না।

পড়ার ঘরে ঢুকে বিজু ব্রীফকেসে ল্যাপটপ ঢুকিয়ে দরকারি কাগজপত্রগুলো দেখে নেয়। টেবিলের ড্রয়ার খুলে ঘড়ি পরে। ওয়ালেট পকেটে ঢোকায়। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার। কোমরে বেল্টের সঙ্গে ক্লিপে আটকানো ইন্টারঅ্যাকটিভ পেজার আর সেলফোন। হাতে চাবির গোছা। বিজুর সশস্ত্র অফিসযাত্রা। অস্ত্রশস্ত্র কিছু বাদ পড়লো কি?

সকালে এক কাপ কফি ছাড়া সাধারণত কিছু খায় না বিজু। এমনিতে চা পছন্দ হলেও সকালে ব্ল্যাক কফি ছাড়া ঘুমের রেশ ঠিকমতো কাটে না। সময় থাকলে কখনো কখনো সিরিয়াল। সকালে না খাওয়া নিয়ে অনেক গজগজ করে রানু ইদানিং ক্ষান্ত দিয়েছে। রানু সকালে নেয় দুধ-সিরিয়াল অথবা জেলি-মাখন ছাড়া শুকনো দুটো টোস্ট আর এক কাপ চা।

ফুলটুসকে উঠে পড়ার তাগাদা দিতে গিয়ে বসার ঘরের দেয়ালে ফুটোটা চোখে পড়ে আবার। কেমন করে যেন একটা ফুটো হয়েছে, ক'দিন আগে দেখেছে। অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স-এর অফিসে বলা দরকার মেরামত করার জন্যে। ভুলে গিয়েছিলো। অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে বাস করার এই এক সুবিধা। কোনো মেরামতির দরকার হলে ফোন করে বলে দাও, ওদের লোকজন এসে সারিয়ে দিয়ে যাবে।

ঘরগুলো রং করার জন্যে আর কার্পেট বদলে না দিলেও অন্তত শ্যাম্পূ ক্লিনিং-এর জন্যে বলা হয়েছিলো মাসখানেক আগে, তারও তাগাদা দিতে হবে। এই অ্যাপার্টমেন্টে আছে ওরা চার বছর। এর মধ্যে একবারও রং করে দেয়নি। অনেক জায়গায় রং নষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও দেয়ালে ফুলটুসের বিদ্যাচর্চা আর শিল্পকর্মের নমুনা। আজ অফিস থেকে ফোন করে দিতে হবে, মনে থাকলে হয়।

রানুর অবশ্য ভাড়া বাসায় আর থাকার ইচ্ছে নেই, সে নিজস্ব বাড়ি চায়। আমেরিকান ড্রীম। এ দেশে আসার পরপরই আমেরিকান ড্রীম কথাটা শুনেছিলো। বেশ অনেকদিন লেগে গিয়েছিলো জানতে – নিজস্ব একটি বাড়ির মালিক হওয়া নাকি আমেরিকান ড্রীম, অন্তত সেই কথিত স্বপ্নের একটা বড়ো অংশ। ঠিক বোঝা যায়নি। একটি বাড়ি, আশ্রয় তো মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে, এ দেশে তা অর্জন করাও কঠিন কিছু নয়। তা স্বপ্ন হবে কেন? স্বপ্নের উচ্চতা কি আরো বেশি, আরো দুরধিগম্য হওয়ার কথা নয়? মানুষ এতো স্বপ্নহীনও হয়! স্বপ্ন-কল্পনা এমন সীমাবদ্ধ!

এই প্রাচুর্যের দেশে এতো ছোটো স্বপ্ন দেখা হয় কেন, কে জানে। অবশ্য যে দেশে জর্জ বুশের পুত্রের নামও হয় জর্জ বুশ, তাদের কল্পনাশক্তি আর কোন উচ্চতায় যাবে! এর মধ্যে হয়তো এক ধরনের তীব্র আত্মকেন্দ্রিক অহংবোধও প্রকাশ পায়, অথচ স্বপ্ন দেখতে জানলে ভূমিহীন চাষী আতর আলীও তার ছেলের নাম আকাশ রাখতে পারে, মেয়ে হলে ফুলের নামে নাম দেয়।

রানু বেশ কিছুদিন আগে বাড়ি কেনার ইচ্ছে জানিয়েছে, সেই বাবদে নিজের রোজগারের প্রায় পুরোটা সে জমাতে শুরু করেছে। তৈরি বাড়ি কেনা তার ইচ্ছে নয়, শহরের একটু বাইরে কোথাও এক একরের মতো জমি কিনে নিজের পছন্দমতো তৈরি করে নেওয়ার বাসনা তার। অফিসে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজের বাড়ির ফ্লোর প্ল্যান কমপিউটারে এঁকে ফেলেছে সে। প্লটারে প্রিন্ট করিয়ে এনে দেখিয়েছিলো বিজুকে। সত্যি চমৎকার প্ল্যান, পেশাদার আর্কিটেক্টের কাজ আর কি। আর্কিটেক্ট বউ থাকলে এরকম সুবিধা পাওয়া যাবে, কখনো ভাবেইনি সে। ক'জনের এমন ভাগ্য হয়!

বিজু নিজে বাড়িঘরের মালিকানায় একেবারে উৎসাহী নয়। বিশেষ করে এই পরদেশে। টাকাপয়সার সমস্যা নেই, এ দেশে কেউ নগদে পুরো টাকা দিয়ে বাড়ি কেনে না। ব্যাংক বা মর্টগেজ কোম্পানি বাড়ির দাম দিয়ে দেয়, তারপর মাসিক কিস্তিতে সুদে-আসলে পনেরো বা তিরিশ বছরে শোধ করে বাড়ির মালিকানা নিজের হয়। কেনার সময় নিজের পকেট থেকে যতো বেশি টাকা দেওয়া যায়, মাসিক কিস্তি সেই অনুপাতে কমে আসে।

রানুর ইচ্ছে, যতোটা বেশি সম্ভব টাকা আগাম দিয়ে ফেলা এবং তিরিশ বছরের বদলে পনেরো বছরের মেয়াদে যাওয়া। এসব বিষয়ে খোঁজখবর বিজু খুব জানে এমন নয়, তবে এটুকু জানে বিল্ডাররা তাদের নিজেদের ফ্লোর প্ল্যান অনুযায়ী যেসব বাড়ি তৈরি করে, সেখানে নিজেদের তদারকির তেমন কিছু নেই। ওরাই সব করে দেবে। জায়গা কিনে নিজেদের প্ল্যানে বাড়ি তুলতে কী ঝকমারি হবে, বুঝতে পারছে রানু? প্রত্যেকটি জিনিস নিজে পছন্দ করে কিনতে হবে, কাজের দেখাশোনা করতে হবে। এতো সময় কোথায় পাওয়া যাবে? রীতিমতো কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার ইচ্ছের মতো ব্যাপার।

দু'জনের চাকরি, বাচ্চার দেখাশোনা, হাটবাজার, রান্নাবান্না, লন্ড্রি, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, কিঞ্চিৎ সামাজিকতা করতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাঝেমধ্যে দু'কাপ চা নিয়ে কিছুক্ষণ বসা ছাড়া দু'জনের তেমন করে দেখাও হয় না। আর এ দেশে থাকা না-থাকার মীমাংসা এখনো হয়নি। যদি না-ই থাকবে তাহলে বাড়ি বানানোর ঝামেলায় গিয়ে কাজ কী!

বিজু জানে, রানুর আগ্রহের মূলে ওই থাকা-না-থাকা। বাড়ি বানানো হয়ে গেলে দেশে ফেরার কথা উঠলে অনায়াসে বলতে পারবে, নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় যাবো! কেন যাবো! বিজু আমেরিকান ড্রীম-এর ফাঁদে পড়তে অনিচ্ছুক।

রানুর বাড়ির প্ল্যান দেখে বিজু বলেছিলো, খুব চমৎকার। এই প্ল্যানে একটা বাড়ি আমরা দেশে ফিরেও বানাতে পারিনা?

হ্যাঁ, পারি। কিন্তু আমি চাই না।

কেন, জানতে পারি?

রানু গলায় সামান্য উষ্মার ফোড়ন যোগ করে সিদ্ধান্ত জানায়, তোমাকে বলেছি, আমরা এখানে থেকে যাচ্ছি। দেশে বছরে বছরে যাবো বেড়াতে, থাকতে নয়।

কিন্তু রানু, আমরা এখানে থাকবো বলে আসিনি, এসেছিলাম তোমার লেখাপড়ার জন্যে। সেটা হয়ে গেছে আগেই, মাঝখানে আমার পড়াশোনার জন্যে খানিকটা দেরি হয়ে গেলো। এখন আরো শেকড়বাকড় না ছড়িয়ে আমাদের গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবা উচিত।

তুমি উচিত মনে করতে পারো, আমি করি না। আমাদের মতো অন্য দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ দেশে এসে বসবাস করছে। করছে না?

বিজু বলে, তোমাকে আগেও বলেছি, সবাই যা করবে আমাদেরও তা করতে হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের জীবন আমাদেরই, অন্য কারো সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে ভুল হবে। অনেকে এসেছে যারা দেশে কিছু করতে পারেনি অথবা পারবে না বুঝে গেছে। আমাদের পরিস্থিতি তা নয়। আমরা এসেছিলাম একটা প্রয়োজনে, কর্মজীবনে নিজেদের আরো সাফল্যের জন্যে যোগ্য হতে। সে প্রয়োজন মিটে গেছে। বন্ধু-পরিজন ছেড়ে পরের দেশে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা কেন উচিত আমি বুঝতে পারি না রানু।

দেশে ফিরে কী হবে? বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমার কী কাজে লাগবে?

আমরা আমেরিকা আসার আগে পর্যন্ত যেভাবে লেগেছে সেভাবে লাগবে।

আমি চাই না, তবু যদি যাওয়ার কথা বলো, আরো কয়েক বছর থেকে কিছু টাকাপয়সা গুছিয়ে নিয়ে যেতে চাই যাতে দেশে গিয়ে মাথা গোঁজার একটা নিজস্ব ব্যবস্থা করতে পারি, কিছু একটা করতে পারি নিজে থেকে।

বিজু বলে, এখনই উপযুক্ত সময় বলে আমি মনে করি। দেরি করলে বয়স বাড়বে, তখন নিজে কিছু করার উদ্যম থাকবে না, সাহসও নয়। মেয়ে বড়ো হলে ফেরা আরো কঠিন হয়ে যাবে। ওর এখন যা বয়স, ও খুব সহজে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবে। পরে তা আর অতো সহজে হবে না। আরেকটা কথাও আমার খুব মনে হয়। তুমি মানবে কি না জানি না, কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে যে একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে তার পেছনে অনেকটা দায়ী এই অসহ্য ব্যস্ততার জীবন।

রানু বলে, দেশে ফিরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে ভাবছো কেন?

আমি জানি যে ব্যস্ততার কথা বললাম, বন্ধু-পরিজনহীনতার কথা বললাম তারও একটা মানসিক চাপের দিক আছে। সেই চাপের ফলে আমাদের অনুভূতিগুলো ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে থাকে সারাক্ষণ, একটু টোকাও সহ্য হয় না।

রানু ঠাট্টার সুরে বলে, তুমি সাইকোলজি নিয়ে চর্চা শুরু করলে কবে থেকে?

বিজু বলে যায়, একটা কথা ভেবে দেখো, আজ এখন যদি আমরা দু'জনে একটা ছবি দেখতে যাবো ভাবি, প্রথমে চিন্তা করতে হবে ফুলটুস কোথায় থাকবে? বেবিসিটার খুঁজে রেখে গেলেও একটা চিন্তা মাথায় থাকবে। অথচ দেশে হলে কী হতো? মেয়েকে তোমার মা-র কাছে বা আমার মা-র কাছে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতে। সময়টা ভালো কাটতো।

এটা শুধু নমুনামাত্র, এরকম হাজারটা পরিস্থিতির কথা তোমাকে বলতে পারি। এই নিশ্চিন্তি এ দেশে আমরা কোনোদিন পাবো না, রানু।

তুমি কী বলছো বুঝতে পারছি, কিন্তু এখানে বসে দেশের যা খবর পাই, কাগজে পড়ি, তাতে নির্ভাবনায় ঘরের বাইরেও নাকি যাওয়া যায় না। গেলে আস্ত ফেরা যাবে কি না কেউ জানে না। এই অশান্তির মধ্যে গিয়ে আমার দরকারটা কী?

তাই বলে সবাই যে নন্দলাল হয়ে সারাক্ষণ ঘরে বসে আছে, এরকম ভাবারও কোনো কারণ নেই। তুমি অযথা কেন জেদ ধরে আছো, বুঝতে পারি না।

রানু সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়, বুঝতে তোমাকে হবে না। আমি যাচ্ছি না। তুমি চাইলে একা ফিরে যেতে পারো। মেয়েকে নিয়ে আমি বেশ থাকতে পারবো।

ঠিক এই ধরনের কথা সে আগে একবার শুনেছিলো বলে মনে করতে পারে বিজু। তখনকার ভাষ্য ছিলো, তুমি থাকলে থাকো, আমি চললাম। এখন তা বদলে গিয়ে হয়েছে, তুমি গেলে যেতে পারো, আমি যাচ্ছি না। তার দেশে ফেরার বাসনা এবং রানুর অনিচ্ছা নিয়ে ভাবতে গিয়ে বিজু দেখেছে, মানলে দু'পক্ষেই একশো একটা যুক্তি আছে, না মানলে একেবারেই নেই। রানু থেকে যেতে চায় বলেই তার চলে যেতে চাওয়া? '...আ কনস্ট্যান্ট ব্যাটল ফর দ্য আলটিমেট স্টেট অব কন্ট্রোল...।'

ফুলটুসকে নিয়ে বেরোনোর সময় বিজু দেখে রানু চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ছোটো করে বলে, চলি রানু।

আজ কি তোমার ফিরতে দেরি হবে?

ঠিক বলতে পারছি না, অফিসে যাচ্ছি তিনদিন পর। গেলে বুঝতে পারবো। কেন?

না, এমনিতেই।

ফুলটুস বলে, যাচ্ছি মা।

রানু বলে, এই দুষ্টু মেয়ে, মাকে চুমু দিতে হবে না?

ফুলটুস ছুটে গিয়ে মা-র গালে চুমু দিয়ে এসে বাবার হাত ধরে।

অফিসে পৌঁছে বিজুকে মিটিং-এ ছুটতে হয়। কোনোমতে এক কাপ কফি নিয়ে ঢুকে পড়ে কনফারেন্স রুমে। মিটিং শেষ হতে হতে সাড়ে দশটা। ফিরে এসে কমপিউটারে বসে। ইনবক্সে উঁকি দিয়ে দেখে, দুশো একুশটা ইমেল তার অপেক্ষায়। প্রেরকের নাম আর সাবজেক্ট লাইন দেখে জরুরি মনে হলে বেছে বেছে মেসেজগুলো দেখতে থাকে। দরকার হলে তাৎক্ষণিক উত্তর।

একটা মেসেজের উত্তর লিখছে, এই সময় নতুন ইমেল। রানু। বিজু সামান্য অবাক হয়, দরকার হলে রানু সাধারণত ফোন করে। আজ ইমেল? কৌতূহল চেপে অর্ধেক লেখা মেসেজ শেষ করে পাঠিয়ে দেয়।

রানুর ইমেল খোলে বিজু। রানু লিখেছে, কাল রাতের জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। মুখ ফুটে বলা হয়নি, কিন্তু তুমি যে ক'দিন বাইরে ছিলে, আমার খুব মন খারাপ ছিলো। তোমাকে খুব মিস করেছি। কাল যখন ঘরে ঢুকলে, না-জানা একটা অভিমান আমাকে গিলে ফেললো। যা কিছু বলবো ভেবেছিলাম, মুখে এলো না। জানি না আমি এমন কেন। যে কথাটা যেভাবে বলতে চাই, হয় না। প্রায়ই তা মুখে আসে একেবারে অন্যরকম হয়ে। কাল রাতে খাবার টেবিলে তোমার সামনে গিয়ে বসতে তুমি বললে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে। আমার এমন মন খারাপ হলো! তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি, তুমি কি জানো!

চমক দেওয়ায় রানুর জুড়ি নেই, বিজু জানে। কিন্তু ব্যাপারটা কী হচ্ছে, বোঝা দরকার। বাইরে এসে সিগারেট ধরায় সে। সেলফোনে রানুর নাম্বার ডায়াল করতে শুরু করেও কেটে দেয়, এটা ইমেলেই থাক। ফিরে এসে রানুর মেসেজের জবাব লেখে, তোমার সময় থাকলে একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি।

পছন্দের গ্রীক রেস্টুরেন্টে বসে রানু বলে, আমরা লাঞ্চে মাঝে মাঝে একত্র হতে পারি, কী বলো?

খুব ভালো হয়। লাঞ্চ মিটিং জাতীয় কিছু না থাকলে বিপদে পড়ে যাই, কোথায় যাবো খেতে? যেটাই ভাবি অরুচি হয়, মনস্থির করতে পারি না। গাড়িতে উঠে যে কোনো এক জায়গায় ঢুকে পড়ি। মাঝে মাঝে যদি সেটা বদল হয়, তুমি যদি ঠিক করে দাও কোথায় যাবো খেতে, তাহলে বেঁচে যাই।

আমি তো সবদিনই আসতে পারি। তোমার যেদিন সময় থাকবে, ফোন করে দিও।

খুব ঘন ঘন হলে আবার হজম হবে তো?

বিজুর শ্লেষ গায়ে মাখে না রানু। বলে, একেকদিন একেক ধরনের রেস্টুরেন্টে যাওয়া যায়। কতো দেশের খাবার চোখেও দেখিনি - ব্রাজিলিয়ান, কোরিয়ান, ভিয়েতনামী, রাশান।

খাবারটা ভালো ছিলো। বিজুর ভালো লাগলো নিজেদের মতান্তরের বিষয়গুলো খাবার টেবিলে না আনা। সবসময় যদি এমন হতো! গতরাতের স্বপ্নের কথা তখন সে ভুলে গেছে।

সন্ধ্যায় খুব ফুরফুরে মেজাজে ফেরে বিজু। ভেতরে ঢুকে বোঝে, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ফুলটুসের এই সময়ে থাকার কথা টিভির সামনে, তার বদলে বসে আছে রানু। গম্ভীর থমথমে মুখ, দুপুরে গ্রীক রেস্টুরেন্টে দেখা মুখের সঙ্গে মেলে না।

বিজু জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

গলা চড়িয়ে রানু বলে, কী হয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? তোমার আদরের মেয়েকে ডাকো।

কী হয়েছে, বলবে তো!

হবে আবার কী? বাপের আদরে তো মাথায় উঠে বসে আছেন মহারানী।

জানা কথা। ফুলটুস কিছু একটা করলে তা শেষ পর্যন্ত বিজুর দোষ বলে সাব্যস্ত হবে। নতুন কিছু নয়। সে ব্রীফকেস পাশে নিয়ে সোফায় বসে। অপেক্ষা করে অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্যে। কিন্তু ফুলটুস কোথায়? নিজের ঘরে?

রানু বলে, মেয়েটা এমন অবাধ্য আর বেয়াদব হয়েছে, বলার নয়। ওকে ডে কেয়ার থেকে তুলে নিয়ে বাসায় ঢুকেছি, এই সময় হিউস্টন থেকে আপা ফোন করলো। কথা বলছি ফোনে, এদিকে তোমার মেয়ে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা বলতে চায়। আমি যতো বলি, একটু দেরি করো, ফোনে খালামনির সঙ্গে কথা বলছি, সে ততো চিৎকার করে। শেষ পর্যন্ত পিটিয়ে থামাতে হলো।

বাচ্চাদের মারধর করার পক্ষপাতী বিজু নয়, যদি না সেটা সত্যিকারের গুরুতর কিছু হয়। অথচ রানু তুচ্ছ অজুহাতে মেয়ের গায়ে হাত তোলে। এসব নিয়ে ঝগড়াঝাটি কম হয়নি। বিজু আশেপাশে থাকলে সে নিজে মেয়েকে আগলে রাখে, সরিয়ে নিয়ে যায় রানুর নাগালের বাইরে। রানুর জবানীতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ফুলটুসের অপরাধ মার খাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো না।

বিজু বলে, শুধু শুধু কেন মারধর করো মেয়েটাকে?

শুধু শুধু? অমন বেয়াদবি করবে কেন?

তোমার জায়গায় আমি হলে, আপাকে ফোন একটু ধরতে বলে মেয়ের কথাটা আগে শুনে নিতাম। অথবা বুঝিয়ে বলতাম, ফোনে আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। মারধর করতাম না কিছুতেই। সামান্য কারণে তুমি ওর গায়ে হাত তুলে কার কী উপকার করছো, তুমিই জানো।

তোমার কাছে তো সামান্যই মনে হবে।

সামান্য না তো কী? তুমি নিজে ভেবে বলো, কার কী ক্ষতি সে করেছে। তার কিছু বলার ছিলো, সে তোমার মনোযোগ চেয়েছে। বাচ্চারা তা সবসময় চায়, তাতে দোষের কিছু নেই। চিৎকার-চেঁচামেচি করে থাকলে নিশ্চয়ই ঠিক করেনি। আসলে কী জানো, আমরা হয়তো

ওকে ঠিকমতো শেখাতে পারিনি, বাবা-মা ব্যস্ত থাকলে ওকে অপেক্ষা করতে হবে তার কথাটা বলার জন্যে।

তার মানে, তুমি বলছো আমি ওকে কিছু শেখাই না!

বিজু পরিচিত রানুকে দেখতে পাচ্ছে আবার। গ্রীক রেস্টুরেন্টে আজ দুপুরে গিয়েছিলো হয়তো অন্য আরেকজন কেউ, রানু নয়।

সে বলে, আমি কিন্তু বলেছি আমরা, আমিও এর বাইরে না।

রানু তা মানবে কেন? বলে, তোমার ঠেস দিয়ে কথা বলা আমি বুঝি না?

আর কথা নয়। বিজু উঠে পড়ে। পড়ার ঘরে ব্রীফকেস নামিয়ে রাখে। হাতঘড়ি খুলে, পকেট-টকেট খালি করে নিরস্ত্র হয় সে। যুদ্ধবিরতির সময় এখন। ফুলটুসের ঘরে গিয়ে দেখে, সে ঘুমাচ্ছে। এই সময়ে সে কখনো ঘুমায় না। দিনের ঘুম তার চিরদিনের শত্রু, খুব ছোটোকাল থেকেই। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েকে দেখে বিজু। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে, চোখের পানি শুকিয়ে দাগ রেখে গেছে গালে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে নতুন বারবিকে। একটা শ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসে বিজু।

খানিক পরে মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞেস করে, কী রে ম্যাকডোনাল্ডস-এ যাবি?

খুব যাবে। মেয়ের খাওয়া যেমন তেমন, একটা খেলনা তো পাওয়া যাবে! উঠে পড়ে ফুলটুস। বিজু বলে, যা ভালো করে মুখহাতটা ধুয়ে আয়।

গাড়িতে ফুলটুস জিজ্ঞেস করে, আমি না থাকলে মা খুব খুশি হবে, তাই না বাবা?

সে কী রে, এরকম পচা কথা তোর কেন মনে হলো?

মা আমাকে একটুও দেখতে পারে না, শুধু বকে আর মারে।

তুই মা-র পেটের ভেতরে কতোদিন ধরে ছিলি, তোকে বলেছি না? ভালো না বাসলে মা তোকে অতোদিন পেটের মধ্যে নিয়ে বেড়াতো নাকি?

ফুলটুস আরো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, বিজু কথা ঘোরায়। বলে, তোর স্কুল কেমন হলো আজ?

জানো বাবা গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে ছিলো আজ! আমার বন্ধু মিশেলের গ্র্যান্ডপা এসেছিলো, অনেক মজার মজার গল্প বলেছে।

মেয়েকে খাইয়ে ফিরে আসতে আসতে ফুলটুসের বিছানায় যাওয়ার সময় হয়ে যায়। সে আবদার তোলে, আজ তো বিকেলে ঘুমিয়েছি, পরে ঘুমাতে যাই, বাবা?

বিজু বলে, কোনো দুষ্টুমি নয়, কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়।

ফুলটুসকে বিছানায় পাঠিয়ে সিগারেট নিয়ে প্যাটিওতে যায় বিজু। হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগে তার। পুরো সিগারেট না খেয়ে নিবিয়ে ফেলে। রানু একইভাবে টিভির সামনে বসে আছে তখনো। কিছু বলার আগ্রহ হয় না। রাতে খাওয়ার ইচ্ছে নেই বিজুর। বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে বিজু জানে না। ঘুম ভাঙলো অন্ধকার ঘরে, রানুর শরীরের স্পর্শে। তার মুখের ওপর রানুর তপ্ত শ্বাস। বিজুর একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপর স্থাপন করে রানু। দোষ নিঃশব্দে স্বীকার করে নেওয়ার নিজস্ব পদ্ধতি তার। বিজু অনড় থাকার চেষ্টা করে। অথচ শরীর বড়ো বিশ্বাসঘাতক। সে শুধুই রক্ত আর মাংস, খুব স্থূল তার চাওয়া। ভয়ানক নির্লজ্জ লোভী সে। তার অহংবোধ বলে কিছু নেই, আত্মাভিমান নেই। অথচ অহংকার কী ভঙ্গুর!

'যাহাতে অমৃত নাই, তাহা লইয়া আমি কিতা করতাম রে, কিতা করতাম...!' যে অহং শুধু মনে মনে, যাকে শরীরে ধারণ করা যায় না শিরস্ত্রাণের মতো, বর্মের মতো যে সুরক্ষা দেয় না, কী মূল্য আছে তার! কোন কাজে লাগে সে?

'দিস টাইম ইউ'ভ গট নাথিং টু লুজ
ইউ ক্যান টেক ইউ ক্যান লীভ ইট, হোয়াটএভার ইউ চুজ
আই ওন্ট হোল্ড ব্যাক এনিথিং
অ্যান্ড আই'ল ওয়াক আওয়ে আ ফুল অর আ কিং...'

প্রচ্ছদ: অভিজিৎ আসাদ

রচনাকাল: ২০০৪

ইমেল: mz1971@gmail.com